প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : শ্রীমনোমোহন ঘোষ

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

শ্রাবণ ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে একালের লোকের যে পরিচয় তার বেশির ভাগই হচ্ছে ধর্ম ও দর্শনের ভিতর দিয়ে; কাজেই এমন একটা ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল যে, সেকালকার লোকেদের অধিকাংশই ছিলেন সাংসারিক ভোগসুখে উদাসীন, মোক্ষ বা নির্বাণপ্রাপ্তির জন্যে একান্ত লোলুপ। যে সকল পাশ্চাত্য বিদ্বান্ প্রথমে ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করেন, দৈবক্রমে আমাদের উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতা জাতীয় বইগুলি সর্বাগ্রে তাঁদের হাতে পড়ে। এগুলির কিছু পরেই তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সুবিশাল বৌদ্ধসাহিত্য। এসকল পুস্তকের উচ্চাঙ্গের চিন্তা ও অপূর্ব আদর্শবাদ তাঁদের মনে এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এসবের মধ্যেই খুঁজে পেলেন তাঁরা আধুনিক ভারতের পরাধীন ও অধঃপতিত অবস্থার কারণ। তাঁরা ভাবলেন যে, ভারতীয়েরা যখন গোড়া থেকেই ধর্মানুষ্ঠানতৎপর, ইহকালবিমুখ অথবা পরকালের ভাবনায় নিয়ত উদ্বিগ্ন, তাই তাদের এই সাংসারিক দুঃখ-দুর্গতি। প্রাচ্য জাতিগুলি তখন একে একে প্রবল পাশ্চাত্য জাতিসমূহের পদানত হচ্ছিল; তাই উল্লিখিত বিদ্বানেরা ভাবতে পারলেন না যে, ভারতীয়েরা চিরকালই এমন অধঃপতিত ছিল না এবং তাদের সাম্প্রতিক দুঃখ-দুর্দশার জন্যে ধর্মানুষ্ঠানের অনুরাগ বা পরকালের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে দায়ী নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্তও ভারত-তত্ত্বের গবেষকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা চলে আসছিল। ত্যাগ বৈরাগ্য ছাড়াও যে প্রাচীন ভারতবাসীরা জীবনযাপনের আনন্দ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তার একাধিক প্রমাণ হাতে এলেও তাঁরা ভাবতেই পারছিলেন না যে, ধর্ম এবং দর্শন ভারতীয় চিন্তার একমাত্র কথা নয়।

কিন্তু ১৯০৯ সালে মহীশূরের বিখ্যাত শ্যামশাস্ত্রী যখন "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র" নামক সুপ্রাচীন (প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৩০০) রাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশ করলেন তারপর থেকে ক্রমশ আধুনিক পণ্ডিতগণের পূর্বোক্ত মতবাদ বদল করার কারণ ঘটল। এ বইতে রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে এমন সব করিতকর্মা উপদেশ ও ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেল যে, প্রাচীন ভারতীয়দের ইহকালবিমুখতা সম্বন্ধে গোঁড়ামি বজায় রাখা আর সম্ভবপর রইল না। তখন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনায় নূতন যুগ শুরু হয়েছে। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রা আদির নানা বিভাগ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত ব্যক্তি বিবিধ তথ্য বিচার ক'রে চলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার আলোচনা এরূপ বিচারেরই অন্তর্ভুক্ত।

আজকাল কতিপয় ব্যক্তি প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা তথা নাট্যকলার পুনরুজ্জীবনের জন্যে সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছেন, কিন্তু এরূপ পুনরুজ্জীবন কখনো সম্ভবপর নয়। মানুষের গার্হস্থ ও সামাজিকঅনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি তার নিজস্ব দেশকালের সঙ্গে খুব অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই তাদের কোনো উপায়েই আবার পূর্বরূপে বাঁচিয়ে তোলা যায় না।—

"ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।"

প্রাচীন নৃত্য ও নাট্যাভিনয় যতই সুন্দর মনোহারী ও রসনিষ্যন্দী থাক না কেন, কবিকল্পিত উর্বশীর মতো এও চিরকালের জন্যে চলে গেছে; কখনো একে ফিরিয়ে আনা যাবে না, যতই আমরা সেজন্যে চেষ্টা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার স্বরূপটি কেমন ছিল, তার ইতিহাসই বা কি, এসব সম্বন্ধে অনুসন্ধান আমাদের আধুনিক নাট্যকলার সংগঠন ও পরিপুষ্টির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কি নাট্যপ্রয়োগ, কি নাট্যরচনা এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীন নাট্যকলার আলোচনা আমাদের নানা মূল্যবান ইঙ্গিত ও প্রেরণা দিতে পারে।

সংস্কৃত কাব্যের এক মুখ্য অংশ দৃশ্যকাব্য বা তথাকথিত নাটকগুলি। এ শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক অসার বস্তু থাকলেও ভাস, কালিদাস, শূদ্রক আদি কবির অমর রচনাবলীর রস সম্যক্ উপভোগের জন্যেও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ, কাগজের পিঠে লেখা বা ছাপা গানের কথা যেমন গান নয়, তেমনি যে পর্যন্ত অভিনীত হয়ে দৃষ্টিগোচর না হয়, সে পর্যন্ত কোনো রচনাই নাটক-পদবাচ্য নয়। সংস্কৃত নাটক ঠিকঠাক প্রাচীন পদ্ধতিতে অভিনীত হওয়ার সম্ভাবনা কম। কাজেই প্রাচীন পদ্ধতি-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকলে সহৃদয় পাঠক অন্তত সে নাটকের অভিনীত রূপটি কল্পনা ক'রে তার আস্বাদনকে অনেকটা নিখুঁত ক'রে তুলতে পারেন।

ভারতীয় জীবনে শিল্পের স্থান

ভারতীয় নাট্যকলা তথা যে-কোনো শিল্পেরই উদ্দেশ্য আদর্শ বা মর্মকথা বুঝতে হলে সাধারণভাবে জানতে হবে লৌকিক জীবনে এদের স্থান কোথায় ছিল এবং কতখানি ছিল। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে ভেবে থাকেন যে, মুক্তিলাভের আদর্শ ই ছিল ভারতের একমাত্র আদর্শ। মুক্তি বা নির্বাণের চিন্তা ভারতীয় আদর্শের এক বিশেষ দিক হলেও, এর মানে এই নয় যে এর দ্বারা সেকালের লোকদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অস্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিশাল ভারতভূমির অংশবিশেষে কখনো কখনো কৃচ্ছ্রসাধনের দৃষ্টান্ত অল্পবিস্তর দেখা গেলেও প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিতে চতুবর্গের আদর্শ ছিল একান্ত মহান্ ও উপাদেয়। প্রাচীন মনীষিগণ চতুর্বর্গকে বলেছেন চারটি পুরুষার্থ বা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এ চারটির মধ্যে 'ধর্ম' প্রথম, দ্বিতীয় হচ্ছে 'অর্থ' আর তৃতীয় 'কাম' এবং 'মোক্ষ' হচ্ছে সর্বশেষ। ধর্ম বা সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্তব্য ঠিকঠাক ভাবে পালন করা মানুষের জীবনের এক প্রধান কাম্য, কারণ তার দ্বারা সে লাভ করে মানসিক ও দৈহিক শান্তি। বৈধভাবে অর্থাৎ ধর্মানুগত পদ্ধতিতে স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তিগুলির অনুশীলনের দ্বারা সে

লাভ করে ইহকালের সুখ বা কাম, আর সুখকে অর্জন ও রক্ষণের জন্যে চাই অর্থ বা নানাবিধ উপকরণ। যদি কোনো লোক জীবনের এ তিনটি কাম্য-লাভে কৃতকার্য হয় তবে তার পক্ষে মোক্ষ বা নির্বাণের রাস্তা হয় সুগম। মোটামুটিভাবে এই হল চতুর্বর্গের তত্ত্ব। সেমিটিক ধর্মে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ মানুষের পক্ষে (অন্তত তার ধর্মজীবনে) একেবারে নিষিদ্ধ taboo ; আর্য ও আর্যপূর্ব সভ্যতার সম্মিলনের ফলে বিকশিত ভারতীয় সভ্যতা এরূপ মনোবৃত্তিকে কখনো ব্যাপকভাবে বা দীর্ঘকাল ধ'রে প্রশ্রয় দেয় নি। বেদের মন্ত্রাংশ বা প্রাচীনতম অংশে বৈরাগ্য বা মোক্ষের কথা একেবারে অনুপস্থিত ; উপনিষদে মুখ্যভাবে প্রশংসিত হয়েছে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, সন্ন্যাসীর আদর্শ নয়। গীতায়ও সেই আদর্শেরই অনুবৃত্তি। পৌরাণিক হিন্দুধর্মেও কৃচ্ছ্রসাধন বা সন্ন্যাসের মহিমা ঘোষিত হয় নি। আগমে বা তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনায় তো সন্ন্যাস প্রকারান্তরে অনাদৃতই হয়েছে।

জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে এমন স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর ধারণা ছিল ব'লে বৈদিক ঋষির চোখে এখন থেকে অন্যূন আড়াই হাজার বছর আগে প্রতিভাত হয়েছিল শিল্পের পরম তত্ত্ব (philosophy)। তিনি বলেছেন—

শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিকার্য দ্বারা দেবতার স্তব করেছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এইসব শিল্প তাই বুঝতে হবে।... যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পীর যে উপাসনা তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত ক'রে তোলা। শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পীর ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন। —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ [১]

বৈদিক ঋষি শিল্পকে যে শ্রদ্ধা নিয়ে দেখেছিলেন পরবর্তী যুগে তারই আরো প্রসার ঘটেছিল। তাই দেখতে পাই, যেখানেই রাজারাজড়া বা আদর্শ

---

১ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, 'ভারতের সংস্কৃতি,' ১ম সং, পৃ ১২ ; ২য় সং, পৃ, ১৪

পুরুষের বর্ণনা হচ্ছে, কবি সেখানেই তাঁর বিশেষণ দিচ্ছেন 'সকল-কলাপারংগত' বা তদনুরূপ কিছু ব'লে। ভর্তৃহরি তো 'সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন' ব্যক্তিদের পশু বলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু কলা বা শিল্প সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা। তিনি তাঁর নাটক ও নাচগানসম্বন্ধীয় বইকে উল্লেখ করেছেন 'নাট্যবেদ' ব'লে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়, নটেরা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত ও সামাজিক হিসাবে খুব নিচু [২] আর নটী কথার মানে ক্রমে দাঁড়িয়েছে গণিকা। শিল্পের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শিল্পীকুলের প্রতি এমন ঘোর অবজ্ঞা সমাজতত্ত্বের এক মস্ত হেঁয়ালি। এ দুর্বোধ্য হলেও হয় তো একান্ত অবোধ্য নয়। যাক, এখন এসবের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। শিল্পের প্রতি—রসানুভবের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতির এক লক্ষণীয় দিক। উপনিষদের ঋষি পরমপুরুষের সম্বন্ধে বলেছেন—

"রসো বৈ সঃ" "রসস্বরূপ তিনি"।

রসের এই মহিমা সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজে অনেকটা ঐকমত্যের ফলেই হয়তো নাট্যশাস্ত্রকার তাঁর লিখিত গ্রন্থকে বেদ ব'লে উল্লেখ করতে সাহস করেছিলেন। তাঁর আলোচ্য 'নাট্য' হল সকল শিল্প বা কলাবিদ্যার মধ্যে সেরা। কারণ, তিনি বলেন—

"ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে॥"

"এমন জ্ঞান নেই, শিল্প নেই, বিদ্যা নেই, কৌশল নেই, কর্ম নেই যা এই নাট্যে দেখা যায় না।"

নাট্যসম্বন্ধে এরূপ উচ্চ আদর্শ-কল্পনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতীয়দের জীবনে নাট্যের প্রভাব কত গভীর ছিল। ইতিহাসের নানা

---

২ চীনেদের মতো প্রাচীন এবং সুসভ্য জাতির মধ্যেও নটের স্থান সমাজে হেয় ছিল প্রাচীন গ্রীসেও 'কমেডি' অভিনেতাদের সম্বন্ধে অবজ্ঞা ছিল।

সূত্র থেকে আমরা জানতে পাই প্রাচীন ভারতে যে-কোনো প্রকার আমোদ উৎসব আদির সঙ্গে নাট্যচর্চার যোগ খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। দেবতাদের পর্বদিনে, বিবাহে, গৃহপ্রবেশে ও বিজয়োৎসবাদিতে নাট্যানুষ্ঠান ছিল প্রায় অপরিহার্য। নাট্য কাব্য ও উপকথার সাহিত্য থেকেও জানা যায় যে প্রায় প্রত্যেক রাজ-পুরীর সঙ্গে যুক্ত ছিল নাট্যশালা বা সংগীতশালা।

দৃশ্যকাব্য, রূপক বা নাট্য

নাট্যকলার কথা বলতে গেলে আমাদের মনে পড়ে একালের নাটক প্রহসন আদি। কোনো কোনো অংশে আধুনিক নাট্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও প্রাচীন কালের ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রযোজিত বইগুলি একটু পৃথক ধরনের বস্তু। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনার আগে লক্ষ্য করা উচিত তাদের প্রাচীন নাম-তিনটির প্রতি। প্রযোজিত গ্রন্থগুলিকে কখনও বলা হয় 'দৃশ্যকাব্য' অর্থাৎ যে কাব্যে বর্ণিত বিষয়গুলিকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা হয়। শুধু পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গল্পাংশটিকে বোঝা যায় ব'লে একে অভিনয়ের সাহায্যে দেখবার বস্তু ক'রে তোলা যায়। যে কোনো ঘটনাই এ পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্ত (reproduced) হতে পারে, কিন্তু তার কাব্যত্ব বা রসোদ্‌বোধনের শক্তি না থাকলে তাকে দৃশ্যকাব্য বলা চলবে না। দৃশ্যকাব্যকে 'রূপক'ও বলা হয়। চতুর্বিধ অভিনয় ও নৃত্যাদির সাহায্যে নটনটীরা গ্রন্থোক্ত আখ্যানবস্তুকে রূপদান করে বলেই এর নাম হয়েছে 'রূপক'। দৃশ্যকাব্য বা রূপককে কখনও কখনও 'নাট্য'ও বলা হয়েছে, যেমন 'নাট্যশাস্ত্র' 'নাট্যবেদ' ইত্যাদি নামের প্রসঙ্গে। এই নাট্য নামটি থেকেই বোঝা যেতে পারে প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের বিশেষত্ব। যা নৃত্যক্রিয়ার ('নট' ধাতুর অর্থ নৃত্য করা) দ্বারা সম্পন্ন করার উপযুক্ত, তাই হল নাট্য। কিন্তু এ অর্থ ভাষাতাত্ত্বিকের মনগড়া ব্যুৎপত্তিমাত্র নয়।

সুপ্রাচীন 'হরিবংশ' (আনুমানিক ৪০০ খ্রীঃ) নামক মহাভারতের পরিশিষ্টে আছে 'নাটকং ননৃতুঃ' (নাটক নাচ্‌ল অর্থাৎ অভিনয় কর্‌ল)। 'কর্পূর-মঞ্জরী'তে (আঃ ১০০০ খ্রীঃ) 'সট্টঅং ণচ্চিদব্বং (সট্টক নাচ্‌তে হবে) এরূপ উক্তি আছে। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যগুলির অভিনয়ের সঙ্গে নাচের বিশেষ যোগ আছে বলেই এদের সাধারণ নাম 'নাট্য'।

নৃত্যের সঙ্গে গীতের যোগ ঘনিষ্ঠ, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যও চাই। এজন্যে নাট্যশাস্ত্রকার বলেন—

"গীতেষু যত্নঃ প্রথমং তু কার্যঃ
শয্যা হি নাট্যস্য বদন্তি গীতম্।
গীতে চ বাদ্যে চ হি সংপ্রযুক্তে
নাট্যস্য যোগো ন বিপত্তিমেতি॥"

"(নাট্যপ্রয়োগে) নানা গীতে প্রযত্ন সর্বাগ্রে করবে ; কারণ, গীতেই নাটকের শয্যা বা সুখে অবস্থানের জায়গা একথা (পণ্ডিতেরা) বলেন। গীত ও বাদ্য সংযুক্ত হলে নাট্যের প্রয়োগ বিপন্ন হয় না।"

বাদ্য সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ কথা আছে নাট্যশাস্ত্রে।

সেই বচন থেকে দেখা যায় যে, নাট্যপ্রয়োগে বাদ্যও গীতের মতো সর্বাগ্রে মনোযোগের বস্তু। নাট্যের সঙ্গে গীতবাদ্যের সম্পর্ক যে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল তা এ সকল প্রমাণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। নৃত্য গীত ও বাদ্য এ তিনের সম্মিলিত নামই ছিল 'সংগীত'। 'সংগীতরত্নাকরে' আছে—

"নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।"

অথচ আজকালকার ভাষায় 'সংগীত' মানে কণ্ঠসংগীতমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন ভারতে নাট্যশালাকেই সংগীতশালাও বলা হ'ত। কালিদাস যে তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে 'সংগীদশালা' (সংগীতশালা) দ্বারা নাট্যশালাকেই বুঝিয়েছেন তাতে সংশয় নেই। অভিনয়ের সঙ্গে গীতবাদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে প্রাচীন ভারতের দৃশ্যকাব্যগুলি অভিনীত হওয়ার

বেলায় প্রায়শ 'অপেরা' (গীতিনাট্য) বা 'ব্যালে'র (নৃত্যাভিনয়) আকার ধারণ করত। নাট্যশাস্ত্রে এদের প্রয়োজনার যে নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ আছে সে-সকল দেখে এরকমই মনে হয়। নৃত্য-গীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ-বশত দৃশ্যকাব্যগুলির রচনায়ও কতকগুলি বিশেষত্ব দাঁড়িয়েছে। খুব সম্ভব সেগুলি দেখেই পাশ্চাত্যদেশবাসী ভারত-তত্ত্বের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বেশির ভাগকেই নাটক বা 'drama বলতে নারাজ। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের কোনো শ্রেণীবিশেষকেই বলা হয় 'নাটক', সবগুলিকে নয়। দৃশ্যকাব্য বা রূপকগুলি (নাটক প্রকরণাদি) যে দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, নাটক তার মধ্যে অন্যতম।

নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গে নৃত্যের প্রয়োগ খুব ব্যাপক হলেও এর মূলগত ব্যাপার আধুনিক নাটকের মতোই মানবচরিত্র তথা কর্মের অনুকরণ। এজন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥
যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥"

"(কোনো রচনায়) দেবতা, মুনি, রাজা, গৃহস্থলোক আদির আচরিত কর্মের অনুকরণ করলে তবে তাকে নাট্য বলা হয়।

সুখদুঃখযুক্ত লোকের যে স্বভাব আঙ্গিকাদি অভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করলে তাকে নাট্য বলা যায়।"

আর রসভাব-ব্যঞ্জনাদ্বারা আনন্দদান এবং উপদেশদান এ উভয়ই হ'ল নাট্যপ্রয়োগের উদ্দেশ্য। তাই শাস্ত্রকার বলেন—

"এতদ্ রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াসু চ।
সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি ॥"

"(অভিনয়ে প্রকাশিত) নানা রসে, ভাবে ও আচরণে নাট্য সকলের পক্ষে উপদেশজনক হবেই।"

আজকালকার দিনে যাঁরা শিল্পমাত্রকেই উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ রসোদ্‌বোধনের চেষ্টাতে পরিণত দেখতে চান অর্থাৎ যাঁরা বলতে চান, আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' ভারতীয় নাট্যের শাস্ত্রোক্ত উদ্দেশ্যের কথা শুনে তাঁরা হয়তো খুশি হবেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ধরনের উদ্দেশ্য-কল্পনাকে নিন্দা করা যায় না। যেহেতু শাস্ত্রকার নাট্যকে নিছক উপদেশদায়ক ব'লে কল্পনা করেন নি। এ উপদেশ দেবার যে ধরন অর্থাৎ অভিনয় দ্বারা রস-ভাবাদি ব্যঞ্জনার ব্যাপার, তার উপর তাঁরা সমানই জোর দিয়েছেন। এ কথাগুলি পরবর্তী আলংকারিকেরা আরো স্পষ্ট ক'রে বলেছেন।

দৃশ্যকাব্যের সাধারণ লক্ষণ

ভারতীয় নাট্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনার পর দেখতে হবে দৃশ্যকাব্য ও আধুনিক [৩] দেশী বিদেশী নাট্যগ্রন্থের মধ্যে প্রভেদ কোন্‌খানে। সেকালের ভারতীয় নাট্যকলাকে বুঝতে হলে এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এ উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে (১) গল্পাংশ 'প্লট্' (২) সংলাপ রচনা ('ডায়লগ্'), (৩) অঙ্কবিভাগ ও (৪) রস-সন্নিবেশ আদি গঠনগত ব্যাপারে মৌলিক সাম্য থাকলেও প্রাচীন ভারতের লেখকেরা এ সবের ক্ষেত্রে কখনো কখনো একটু স্বতন্ত্র পথ ধরেছেন। নিচে সে সকলের আলোচনা করা যাচ্ছে।

(১) দৃশ্যকাব্যের লেখকেরা তাঁদের গল্পাংশ কখনো সংগ্রহ করতেন রামায়ণ

৩ আধুনিক বলতে গত একশ বছরের মধ্যে লেখা নাটকগুলিকে বুঝতে হবে। সে হিসাবে শেকস্‌পীয়ার এবং তাঁর অনুকরণকারীরাও সেকেলেদের দলে।

মহাভারতাদি পুরানো বইগুলি থেকে, কখনো বা লোকপ্রচলিত উপকথা বা গল্প থেকে; 'বৃহৎকথা'র মতো ভারতীয় গল্পের বিশ্বকোষ থেকে নানা দৃশ্যকাব্যের আখ্যান গৃহীত হয়েছে। সমসাময়িক জীবনের কাহিনী উচ্চ শ্রেণীর রূপকগুলিতে প্রায়শ স্থান পেত না। উচ্চশ্রেণীর রূপক বলতে নাটক প্রকরণাদি গম্ভীর রচনাকেই বোঝায়। প্রহসন ভাণ আদি হালকা ধরনের হাস্যরসপ্রধান নাটকে হয়তো কখনো কখনো সমসাময়িক ঘটনাকে নাট্যরূপ দেওয়া হত; কিন্তু সে সম্বন্ধেও খুব নিঃসন্দেহ প্রমাণ নেই। নৃত্যাদি যোগে রূপ দেওয়া অনেকটা সহজ হবে ব'লে হয়তো সেকালে পৌরাণিক বা লোক-প্রচলিত সুপরিচিত আখ্যানগুলিকে নিয়ে দৃশ্যকাব্য রচিত হত।

(২) আধুনিক নাটকে পদ্য প্রায় দুর্লভ, কিন্তু সংলাপ-রচনায় ভারতীয় নাট্যকারগণ গদ্য পদ্য দুয়েরই ব্যবহার করেছেন। পাত্র-বিশেষ (কদাচিৎ পাত্রীও) গদ্য বলতে বলতে হঠাৎ কবিতায় কথা বলছেন; আর সে কবিতাও সর্বত্র আর্যা আদি শিথিল ছন্দের কবিতা নয়, হ্রস্ব দীর্ঘ নানা বিচিত্র ছন্দের কবিতা। এ সব দেখে আধুনিকদের মনে একটু খটকা লাগতে পারে। যাঁরা শিল্পে বাস্তবতা অনুসরণের গোঁড়া পক্ষপাতী তাঁরা নিশ্চয় এ ব্যবহার অনুমোদন করবেন না, কিন্তু যথার্থ উচ্চশ্রেণীর শিল্পের সঙ্গে অন্ধ বাস্তবানুসরণের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো শিল্পবস্তু প্রত্যক্ষ ক'রে মানুষের হৃদয়ে যে রসের সঞ্চার হয় তার প্রধান কারণ সেই শিল্পের প্রভাবে কল্পনার বেগপ্রাপ্তি। যদি যেমনটি দেখা বা শোনা যায় তেমনটি আঁকা বা আবৃত্তি করা যায় তবে তা কল্পনাকে স্পর্শ করবে কী উপায়ে? ভারতের প্রাচীন নাট্যকলার মর্মকথা বুঝতে হলে এ বিষয়ের সত্যটিকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করা একান্ত দরকার। দৃশ্যকাব্যের যেখানে যেখানে সংলাপের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের প্রয়োগ আছে সেখানে প্রায়শ দেখা যাবে যে, বক্তা হয়তো তাঁর হৃদ্‌গত কোনো নিগূঢ় ভাবকে প্রকাশ করছেন অথবা বাইরের প্রকৃতিকে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। এ উভয় কাজেই পদ্যের উপযোগিতা অসামান্য। সাধারণ গদ্য ব্যবহার ক'রে

ভাবোচ্ছ্বাস বা কাল্পনিক চিত্র সহজে ফুটিয়ে তোলা প্রায় দুঃসাধ্য। কথাকে ছন্দে সার্থকরূপে প্রকাশ করলে তা কল্পনার বাহন হয়ে ওঠে।

দৃশ্যকাব্যগুলির সংলাপের আর-এক দিক ছিল চরিত্রানুযায়ী ভাষাবৈচিত্র্য; এটি আধুনিক নাটকেও একেবারে দুর্লভ নয়। তবু ভারতীয় নাটকে এ ব্যাপারটি যত সুস্পষ্ট অন্যত্র তত নয়। উচ্চশ্রেণীর পুরুষ-চরিত্রগুলির ভাষা সংস্কৃত, মধ্যমশ্রেণীর পুরুষ, ও মেয়েদের ভাষা 'শৌরসেনী' আদি প্রাকৃত, চাকর-চাকরানী বা খুব নিচু-শ্রেণীর লোকেদের ভাষা ছিল 'মাগধী' 'পৈশাচী' প্রভৃতি। এ বৈচিত্র্য তৎকালীন সমাজের অর্থাৎ যেকালে প্রথম নাটক রচনা হতে শুরু হয় সেকালকার ভাষাব্যবস্থার প্রতিবিম্ব ব'লে মনে হয়। নাট্যে এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তাকে এমন খানিকটা বাস্তবতার রঙ্ দেওয়া হয়েছে যার ফলে দর্শকের কল্পনার উপর অনেক দাবি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে।

(৩) অঙ্ক-বিভাগ সম্বন্ধে দৃশ্যকাব্যের রচয়িতাগণের ব্যবহার আধুনিক নাট্যকারদের সঙ্গে প্রায় সমান হলেও এক বিষয়ে তাঁদের প্রভেদ আছে। তাঁরা কোনো কোনো অঙ্কের গোড়ায় তার অন্তর্গত মুখ্য দৃশ্যটিকে বোঝাবার জন্য একটি ছোটো দৃশ্য জুড়ে দেন। তাকে কখনো বলা হয় 'প্রবেশক', কখনো 'বিষ্কম্ভক'। প্রাচীন গ্রীক্ নাটকে বা তদনুকরণে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে দূতের মুখে নাটকবহির্ভূত ঘটনার উল্লেখের যে প্রথা আছে, তার সঙ্গে এ ব্যবস্থার তুলনা করা যায়।

(৪) রসের দিক দিয়ে আধুনিক নাট্যকার তাঁর রচনাকে কখনো 'ট্র্যাজিডি' কখনো 'কমেডি' করে তোলেন। কিন্তু দৃশ্যকাব্যের রচয়িতাগণ তেমন ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক বলে ভাবেন নি। তাঁদের কোনো রচনাই বিষাদান্তক নয়। করুণরস শাস্ত্রোক্ত আটটি রসের অন্যতম হলেও দৃশ্যকাব্যের লেখকগণ প্রায় কখনো এ রসকে উৎকটভাবে প্রাধান্য দেন নি। করুণরস আর ট্রাজিডির রস ঠিক এক ধরনের জিনিসও নয়। ভারতীয় সাহিত্যে যে ট্র্যাজিডি গড়ে ওঠে নি তার কারণ এর নিজস্ব ঐতিহ্যধারা। মানুষ যে সর্বপ্রযত্নে

পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রের সঙ্গে যুঝ্‌তে যুঝ্‌তে নানা বিচিত্র অতিলৌকিক ও অদম্য শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে গিয়ে দুঃখ-দুর্দশাকে বরণ করবে এবং সেই সঙ্গে নিজ চরিত্রমহিমা প্রকটিত করবে—এই ছিল ট্র্যাজিডির মূলগত কথা। এ ধরণের মনোভাব ভারতবাসীর কদাপি ছিল না; নিয়তি (fate) মানুষের আত্মবহির্ভূত কোনো বস্তু নয়, নিজ কর্মফল ছাড়া আর কেউ তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, কোনো নিয়তি বা দেবতার ষড়যন্ত্রের উপর তার সুখদুঃখ নির্ভর করে না। জনসাধারনের এধরণের বিশ্বাস ছিল বলে ভারতবর্ষের নাট্য-সাহিত্যে ট্র্যাজিডি দেখা দেয় নি। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যে শৃঙ্গার, বীর ও করুণ রসই প্রায়শ মুখ্যভাবে ফোটানো হয়ে থাকে।

দৃশ্যকাব্যের শ্রেণীবিভাগ

দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় পাওয়ার পরে তাদের শ্রেণী-বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। শাস্ত্রকারগণ দৃশ্যকাব্য বা রূপক গুলিকে দশ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; যথা—নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, ভাণ, সমবকার, বীথী, প্রহসন, ডিম ও ঈহামৃগ। এ শ্রেণীভেদের কারণ দুটি—(১) দৃশ্যকাব্য-গুলির প্রযোজনার ব্যাপারে বিভিন্নাংশে অনুসৃত 'বৃত্তি'র ('মোড্', 'স্টাইল্') তারতম্য, (২) গল্পাংশের প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্যাদি।

নাট্যের বৃত্তি চারটি :-(ক) ভারতী, (খ) সাত্বতী, (গ) কৈশিকী ও (ঘ) আরভটী। দৃশ্যকাব্য-রচনার বেলায় কেবল যে সমগ্র পুস্তকের গল্পাংশ, চারিত্র-চিত্রণ ও রসোদ্ভাবনের দিকেই নজর দিতে হবে তা নয়, নাট্যপ্রয়োগ-কালে এর অন্তর্গত অঙ্কগুলির কোন্‌টিতে কেমন নায়ক-নায়িকা, কেমন ভাষা বেশভূষা এবং কর্মবৈচিত্র্যের অবতারণা করা হবে তাও চিন্তনীয়; এ চিন্তার ফলই দেখা দেয় বৃত্তি-রূপে।

(ক) কোনো অঙ্কে যদি কেবল পুরুষ-চরিত্র থাকে এবং সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হয় তবে বলা হয় সে অঙ্কে অনুসৃত হয়েছে 'ভারতী' বৃত্তি।

(খ) যদি কোনো অঙ্কে কেবল বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্র-রসানুকূল কর্ম থাকে অথবা সে সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে করুণ এবং শৃঙ্গার রসেরও প্রসঙ্গ থাকে তবে সে অঙ্কে 'সাত্বতী' বৃত্তি অনুসৃত হয়েছে এ কথা বলা যাবে।

(গ) যদি অঙ্কবিশেষে পাত্র-পাত্রীরা বিচিত্র বেশভুষা প'রে শৃঙ্গাররসের অনুকূল নানা ভাব অভিনয় করে তবে সে অঙ্কে অনুসৃত বৃত্তির নাম 'কৈশিকী'।

(ঘ) কোনো অঙ্কে যদি পাত্রপাত্রীগণ সাহসিক পুরুষের মতো আচরণ করে বা দম্ভ, মিথ্যাচরণ ইন্দ্রজালাদি প্রদর্শিত হয় তবে বলা হবে যে সে অঙ্ক 'আরভটী' বৃত্তিতে রচিত।

দশ রকমের দৃশ্যকাব্য বা রূপকের মধ্যে নাটক ও প্রকরণ জাতীয় গ্রন্থেই চার রকম বৃত্তির সব কটি ব্যবহার করা যেতে পারে; আর বাকি আট শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে কেবল কৈশিকী ছাড়া অন্য বৃত্তিগুলিই ব্যবহার্য।

দৃশ্যকাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য 'নাটক'। এর বিষয়বস্তু বা গল্পাংশ হবে সুপরিচিত (পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক) আখ্যান, আর নায়ক হবে নানা গুণে গুণী, কখনো বা দেবানুগৃহীত নৃপতি। নানারসযুক্ত অঙ্কে তাঁর চরিত্র বিবৃত হবে; তবে অঙ্কসংখ্যা পাঁচের কম ও দশের বেশি হবে না।

প্রকরণাদি অবশিষ্ট নয় শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের গল্পাংশ হবে রচয়িতার স্বকপোল-কল্পিত। 'প্রকরণে'র বর্ণিতব্য বিষয় ব্রাহ্মণ, বণিক্, রাজমন্ত্রী পুরোহিতাদির চরিত্র। তাতে অবান্তরভাবে দাস, বিট, বেশ্যা ভৃত্যাদির চরিত্রও উল্লিখিত হতে পারে। তবে খুব উচ্চ শ্রেণীর পাত্রদের পারিবারিক ব্যাপারে যুক্ত ক'রে কোনো অঙ্কে এদের অবতারণা করা নিষিদ্ধ। প্রকরণের পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে আর এক কথা এই যে, এতে উদাত্ত নায়ক, দেবতার চরিত্র

বা রাজারাজড়ার প্রেমলীলার কথা বর্ণনা করা চলবে না। এ সব লক্ষণ দেখে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা প্রকরণকে 'বুর্জোয়া কমেডি' বা 'কমেডি অব্ ম্যানার্স্' নামে অভিহিত করেছেন। আর নাটকগুলির কোনো কোনোটিকে তাঁরা 'রোম্যান্টিক কমেডি' বলেছেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বিক্রমোর্বশী আদি এ জাতীয় নাটকের দৃষ্টান্ত।

নাটক প্রকরণের পরেই উল্লেখযোগ্য 'প্রহসন'। এ জাতীয় রচনা আধুনিক 'ফার্স্' বা 'লো কমেডি'র সঙ্গে তুলনীয়। প্রহসন দু'রকমের :—(ক) শুদ্ধ ও (খ) মিশ্র বা সংকীর্ণ। (ক) শৈব সন্ন্যাসী, (বৌদ্ধ) ভিক্ষু, বিদ্বান্ ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, এদের নিয়ে যে হাস্যপরিহাসযুক্ত রচনা, যাতে ছোটলোক-দেরও প্রসঙ্গ আছে তাকে বলা হয় শুদ্ধ প্রহসন। এ প্রহসনে ভাষাটি খুব অবিকৃত বা স্বাভাবিক (naturalistic) হওয়া দরকার। আর এতে সমালোচনার বিষয় হবে কোনো প্রচলিত মতবাদ। (খ) নানা শ্রেণীর দুশ্চরিত্র স্ত্রীপুরুষ ও ছোটলোকদের উচ্ছৃঙ্খল বেশ ভাষা ও আচরণের ব্যাপার নিয়ে যেখানে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয় এমন দৃশ্যকাব্যকে বলা হয় মিশ্র বা সংকীর্ণ প্রহসন।

প্রহসনের পরেই 'ভাণে'র উল্লেখ করা দরকার। ভাণে একটিমাত্র লোক থাকবে 'ধূর্ত' বা 'বিট'। সে একাই দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে নিজের অনুভূত ব্যাপার বা অন্যব্যক্তি-সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনা করবে এবং মাঝে মাঝে তার নিজের সামনে বা দূরে অন্য বক্তার অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে তার সঙ্গে কথা কইবে। একে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেছেন 'মনোলগ্' বা একোক্তি।

উল্লিখিত চার শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের নমুনা সংস্কৃত সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে বাকি যে ছয় রকমের দৃশ্যকাব্যের কথা আছে তাদের কোনো সুপ্রাচীন বা বহুসংখ্যক নমুনা দুর্লভ। তবু প্রাচীন নাট্যকলার ধারাটি সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ করবার জন্যে তাদেরও লক্ষণাদির বর্ণনা দেওয়া যাচ্ছে—

'সমবকার'—এতে বর্ণিত হবে দেবাসুরের আখ্যান এবং নায়ক হবেন প্রখ্যাত ও উদাত্ত, পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বারোর বেশি হবে না। বীররস এতে হবে প্রধান, আর সমুদয় গ্রন্থটি শেষ হবে তিন অঙ্কে। এ দৃশ্যকাব্যে কাপট্য, যুদ্ধ, কোলাহল ও প্রেমলীলা আদি হবে বর্ণনীয়।

'ঈহামৃগ'—দেবতা নায়ক দিব্য স্ত্রীর জন্যে যুদ্ধ করছে এরূপ গল্পাংশ নিয়ে লেখা হবে ঈহামৃগ। এতে প্রেমলীলার বর্ণনার সঙ্গে যুদ্ধব্যাপারও থাকবে। তবে এতে কোনো মানবীর প্রসঙ্গ থাকবে না।

'ডিম'—এতে পাত্রসংখ্যা ষোলো জন থাকবে। ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তি প্রযুক্ত হবে এর রচনায়। এর পাত্রদের মধ্যে থাকবে দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, নাগ; এবং এতে নানা মায়া ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণাদি বর্ণিত হবে। শৃঙ্গাররস ও হাস্যরস ছাড়া আর সব রসের সন্নিবেশ এতে করা যেতে পারে। কিন্তু এর দৈর্ঘ্য তিন অঙ্কের বেশি হবে না।

'ব্যায়োগ'—এর নায়ক হবে কোনো বিখ্যাত রাজর্ষি। তাতে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যবিধ সংঘর্ষের কথা থাকবে; তবে এর দৈর্ঘ্য এক অঙ্কের বেশি হবে না। এর স্ত্রীচরিত্রের সংখ্যা হবে কম কিন্তু পুরুষচরিত্রের সংখ্যা বেশি।

'অঙ্ক'—এর নায়ক হবে কোনো সাধারণ মানুষ। এই একাঙ্ক দৃশ্যকাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা থাকবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে মেয়েদের ক্রন্দন। করুণরস এর উপজীব্য; এ নাট্য রচিত হবে ভারতীবৃত্তিতে।

'বীথী'— এ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য হয়তো ছিল অনেকটা ভাণের মতো। এতে একটিমাত্র অঙ্ক থাকবে; তবে এর পাত্রপাত্রীর সংখ্যা দুই-তিনও হতে পারে এবং সব রকম রসেরই এতে সন্নিবেশ করা চলে।

উল্লিখিত দশ রকম দৃশ্যকাব্য ছাড়া 'নাটী' বা 'নাটিকা' নামে এক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যের কথা যে কেবল শাস্ত্র থেকে জানা যায় তা নয়, একাধিক প্রাচীন নাটিকার নমুনাও মেলে। এই নাটিকায় আছে স্ত্রীভূমিকার বাহুল্য, কিন্তু এতে চারটির বেশি অঙ্ক রাখা চলে না। নৃত্য গীত এবং রাজা-রাজড়ার

প্রেমলীলার বর্ণনাই এর উপজীব্য। দশ শ্রেণীর রূপক বা দৃশ্যকাব্য এবং নাটিকা ছাড়াও অর্বাচীন লেখকদের মতে আঠারো রকমের 'উপরূপক' বা অবান্তর দৃশ্যকাব্য আছে, কিন্তু প্রাচীন নাট্যকলার প্রসঙ্গে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা ততটা অপরিহার্য নয়। তাই বাহুল্যভয়ে তাদের বর্ণনায় বিরত থাকা গেল।

নাটক ও প্রকরণের গঠন

নাট্যগ্রন্থগুলির দশটি বিভিন্ন শ্রেণী থাকলেও তাদের মধ্যে নাটক নাটিকা ও প্রকরণই সমধিক পরিচিত। আর এ কয়েক জাতীয় বইতেই দৃশ্যকাব্যের সকল অঙ্গ বর্তমান। কাজেই প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা বুঝতে হ'লে নাটক ও প্রকরণের সাহিত্যিক গঠন ভালো ক'রে জানা দরকার। নাটক নাটিকা ও প্রকরণের মধ্যে যে ভেদ তা শুধু গল্পাংশ বা আখ্যান নিয়ে; তা ছাড়া গঠনের দিক দিয়ে এ-তিনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে নাটকের কথা বলতে নাটিকা-প্রকরণকেও তার অন্তর্ভুক্ত ব'লে ধরে নিতে হবে।

যে কোনো সংস্কৃত নাটক খুললে সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে তার 'প্রস্তাবনা'। এ অংশটি হচ্ছে সূত্রধারের বা প্রধান নটের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক (বা সহকারী নট) অথবা নটীর কথাবার্তা। এ কথাবার্তা থেকে নাট্যকারের নাম ও পরিচয় এবং নাটকের নাম আদি জানা যায়। এ প্রস্তাবনা অনেকাংশে আজকালকার ছাপানো 'প্রোগ্রামে'র কাজ করত। কিন্তু এসব ছাড়াও প্রস্তাবনার এক গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। নাট্য-দর্শকগণকে তাঁদের অজ্ঞাতসারে বাস্তব জগৎ থেকে হঠাৎ কল্পনার জগতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ প্রস্তাবনার মূল মর্ম। সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক বা নটীর সংলাপপ্রসঙ্গে নাট্যকার এমন সুকৌশলে অভিনীয়মান নাটকের পাত্রপাত্রীদের কথা উল্লেখ করেন বা তাদের কারুর রঙ্গপ্রবেশ ঘটিয়ে দেন যে, সে-অভিনয়ের কৃত্রিমতা চাপা পড়ে যায়। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের প্রস্তাবনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে নাট্যকার এবং নাটকের নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই সূত্রধার নটীকে গান গাইতে বললেন। সময়োপযোগী গানটি গীত হওয়ার পরে সূত্রধার নটীকে বলছেন—

"আর্যে, চমৎকার গান করেছ, তোমার গান শুনে মুগ্ধ রঙ্গস্থ সামাজিক-বর্গকে ছবিতে আঁকা জনসংঘের মতো দেখাচ্ছে। আচ্ছা, কোন্ নাট্য-গ্রন্থ নিয়ে আমরা এঁদের সন্তোষদান করবার চেষ্টা করব ?

নটী—আর্যমিশ্র কি আগেই বলেন নি যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নামক নূতন নাটকের অভিনয় করা হোক।

সূত্রধার—আর্যে, তুমি ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ ; আমি এখনি ভুলে যাচ্ছিলাম। কারণ তোমার গীতমাধুর্য সবলে টেনে নিয়েছে আমার মনকে, যেমন ক'রে টেনে এনেছে বেগবান্ হরিণ এই রাজা দুষ্মন্তকে।"

সূত্রধারের বাক্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গপীঠে দেখা দেন ধনুর্বাণ হস্তে মৃগের পশ্চাতে রাজা ও তাঁর সারথি। এ কৌশলটির দ্বারা নাট্যকার বাস্তব ও কল্পিত বস্তুর মধ্যকার ভেদটিকে বেশ চমৎকারভাবে বিলীন ক'রে দিয়েছেন। দর্শকদের কল্পনা তখন থেকে অনায়াসেই সেই কবি কল্পনাকে সঙ্গ দান ক'রে তার নিজস্ব রসানুভবকে সার্থক ক'রে তোলার সুযোগ পেল।

প্রস্তাবনার পরেই নাটকীয় আখ্যান বস্তুর আরম্ভ। এ আখ্যানবস্তুর মূল কথা হবে নায়কের অভীপ্সিত কোনো ব্যাপারের সিদ্ধি : কোনো প্রণয়িনীকে লাভ, প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়া অথবা অপর কোনো কর্তব্যের সাধন ইত্যাদি। এরকমের উদ্দেশ্যসিদ্ধির যে অবস্থা, তাদের বলা হয়েছে পঞ্চ অবস্থা : যেমন (১) আরম্ভ, (২) প্রযত্ন, (৩) প্রাপ্ত্যাশা (প্রাপ্তিসম্ভব), (৪) নিয়তাপ্তি (ফল পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চয়) ও (৫) ফলাগম। এ পাঁচটি অবস্থার মধ্যে নাটকে সব ক'টিই থাকা প্রয়োজন। তবে অন্য শ্রেণীর রূপকে (যেমন ভাণ আদিতে) চতুর্থ, তৃতীয় চতুর্থ, বা দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অবস্থাকে বাদ

দেওয়া চলতে পারে। নায়কের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল এ পাঁচ অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে আখ্যানবস্তু পাঁচটি বিশেষ রূপে দেখা দেয়, যথা—(১) বীজ, (২) বিন্দু, (৩) পতাকা, (৪) প্রকরী ও (৫) কার্য।

(১) 'বীজ' হচ্ছে আখ্যানবস্তুর সেই অংশ যাতে আছে নাটকীয় ব্যাপারের (action) আরম্ভ। যেমন 'রত্নাবলী' নাটিকায় মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মৎলব (নিজের রাজার সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ ঘটাবার)। (২) 'বিন্দু' বলা হয় নাটকের শেষ অংশটিকে যেখানে নাটকীয় ব্যাপার বাধা পেতে পেতে আবার বেগের সঙ্গে এগিয়ে চলে। যেমন এই রত্নাবলীতেই, মদনমহোৎসবের পরে নায়িকা নিজ বাগ্‌দত্ত পতি রাজাকে চিনতে পেরে তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হচ্ছেন। (৩) 'পতাকা' বস্তুটি হচ্ছে মূল আখ্যানবস্তুর উপকারক কোনো ছোটো ঘটনা (episode)। যেমন 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে মৎস্যজীবী ও রক্ষীপুরুষের দৃশ্যটি। (৪) 'প্রকরী'—আরো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপার (incident) যদি পরোক্ষভাবে মূল নাটকের ব্যাপারকে অগ্রসর ক'রে দেয় তবে তাকে বলা হয় প্রকরী। যেমন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কে মাতলিকৃত বিদূষকের উৎপীড়ন। (৫) 'কার্য'—উল্লিখিত বীজাদি ছাড়া নাটকীয় মূল ব্যাপারকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে পাত্রপাত্রীদের সংলাপে যেসকল চেষ্টা ও চিন্তাদির বর্ণনা করা হয় সে গুলিকে বলা হয় 'কার্য'।

নাটকীয় গল্পাংশকে (১) মুখ, (২) প্রতিমুখ, (৩) গর্ভ, (৪) বিমর্শ ও (৫) নির্বহণ এই পাঁচটি অংশেও বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এ পাঁচটি অংশের মধ্য দিয়ে নাটকের রূপটি ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে। নায়কের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে পঞ্চাবস্থার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, উপস্থিত শ্রেণী-বিভাগ তার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে সেকালকার নাট্যকারগণ নাটক-নির্মাণে কিরূপ সতর্ক পদ্ধতি সুশৃঙ্খলভাবে অনুসরণ করতেন তাই বোঝবার জন্যে সংক্ষেপে নাট্যের শাস্ত্র-সঙ্গত বিশ্লেষণের খবর রাখতে হয়।

ভারতীয় নাট্যের উদ্দেশ্য—রস-উদ্বোধন

উপরের চার অধ্যায়ে প্রাচীন দৃশ্যকাব্যগুলির সাধারণ লক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ ও সাহিত্যিক গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যাবশ্যক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে নাট্যকলা জন্মলাভ করে নি। সাহিত্যের মূলে যা নাট্যের মূলেও তাই। সমাজতান্ত্রিক প্রয়োজনেই অন্য সর্ববিধ কলার মতো এ উভয়ের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যেই মুখ্যত নাট্যের উদ্ভব। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে এই শিল্পটি নিজকে তার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য থেকে বিযুক্ত রাখতে পারে নি বা সে চেষ্টা করে নি। তাই নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন যে, সর্ব বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও নাট্যের অন্যতম উদ্দেশ্য (সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি)। তিনি আরো বলেন—

ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যকরণমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি॥
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখাদিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্॥

...

দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥

'(এ নাট্য) ধর্মাচারীদের (শেখাবে) ধর্ম, কামোপসেবীদের (শেখাবে) কামভোগ; দুর্বিনীতদের (করবে) নিগ্রহ, বিনীতদের (বাড়াবে) দমক্রিয়া

(ইন্দ্রিয়সংযম), ক্লীবদের (ভীরুদের) করবে সাহসী, বীরদের বাড়াবে উৎসাহ, নির্বোধদের দেবে বুদ্ধি, বিদ্বান্‌দের বাড়াবে বিদ্যা, বড়লোকদের শেখাবে বিলাসের পদ্ধতি, দুঃখগ্রস্ত লোককে দেবে স্থৈর্য, অর্থার্জনকারীকে দেবে অর্থ (লাভের সংকেত), উদ্বিগ্নচিত্ত লোকদের দেবে ধৈর্য।... এরূপে সংসারে হতভাগ্য, দুঃখী, শোকার্ত ও শ্রমক্লান্ত লোকদের বিশ্রামদান করবে এই নাট্য।

নাট্যের এ উদ্দেশ্যকে সেকেলে বিবেচনার ফল মনে করবার কিছু নেই। পাশ্চাত্য নাট্যকলার একজন বিশেষজ্ঞও প্রায় ঠিক এধরণের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ যে ব'লে থাকেন নাট্যকলা কেবলমাত্র রসোদ্‌বোধনের ব্যাপার ; নীতি, ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত কোনো উপদেশের সঙ্গে এর কিছুমাত্র যোগ নেই তা নিতান্ত অদ্ভুত। যুক্তিমূলকই হোক আর অযৌক্তিকই হোক মানবজীবনের সঙ্গে যুক্ত সব-কিছুই নাট্যের সঙ্গে সর্বাংশে জড়িত।'[৪]

নাট্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করা গেলেও উপদেশ-দানই নাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যে পদ্ধতি ও যে রূপের মধ্য দিয়ে নাট্যের বিষয়বস্তু (যার সঙ্গে নানা উপদেশ থাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত) প্রকাশ পায় তারি প্রয়োজন হ'ল মুখ্য। এই পদ্ধতি বা নাট্যের প্রয়োগ-কলার প্রধান উদ্দেশ্য হল দর্শকের মধ্যে রসসঞ্চার ক'রে তাকে আনন্দ দেওয়া। কিন্তু 'রস' কা'কে বলে বা রসের উৎপত্তি হয় কিরূপে ? শাস্ত্রকার এর উত্তরে বলেন, 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রস-নিষ্পত্তিঃ।' অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের যোগে রস নিষ্পন্ন

৪। 'It is absurd to assert, as some do, that the art of the theatre is a purely æsthetic function and has nothing to do with 'propaganda,' either moral, religious, or political, The theatre has everything to do with all that concerns the life of mankind, whether rational or irational.' —Theodore Komisarjevsky—The Theatre and a changing civilization. p. 2.

হয়। শাস্ত্রকারের এ উক্তি বুঝতে হ'লে টীকাটিপ্পনী দরকার। 'কোন্ জিনিসটি রস হয়ে দাঁড়াবে ?' রসাধ্যায়ে (৬ষ্ঠ) উল্লিখিত এই বচনটির পরে তিনি যা বলেছেন তার থেকে জানা যায় যে; যে-স্থায়ীভাব বা মুখ্যভাব (dominant emotion) দৃশ্যকাব্যের উপজীব্য, তাই বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের যোগে রসত্ব লাভ করে। এ কথাটি শাস্ত্রকারের ঢের পরবর্তী কালের একজন লেখক সুন্দর ক'রে একটি কারিকায় গুছিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্॥

বিশ্বনাথ কবিরাজ—সাহিত্যদর্পণ

রত্যাদি স্থায়ী ভাব যদি বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বারা ব্যক্ত হয় তবে তা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট রস হয়ে দাঁড়ায়।

এই কারিকাটিকে দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করলেই রস জিনিসটি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান হতে পারে।

স্থায়ী ভাব হচ্ছে আটটি : রতি (ভালোবাসা বা স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসা), হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা (গোপন করার ইচ্ছা) ও বিস্ময়। উপস্থিত প্রসঙ্গে 'স্থায়ী' কথাটির ব্যবহার আপেক্ষিক। কারণ, কোনো লোকের মনে এর কোনো ভাবটিকেই স্থায়ীভাবে বা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করতে দেখা যায় না। তবে কোনো দৃশ্যকাব্য রচনার বেলায় এর কোনো একটিকেই মুখ্যরূপে অবলম্বন করা দরকার। তা নইলে দৃশ্যকাব্য জমে না। পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল নাট্য-রচনায় 'য়ুনিটি অব্ অ্যাক্‌শন্‌স্'এর যে নিয়মটি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয় উল্লিখিত আটটি ভাবের কোনো একটি ভাবকে প্রধানভাবে চিত্রিত করলেই নাট্যের সে 'য়ুনিটি' বজায় থাকে।

'বিভাব' হচ্ছে স্থায়ী ভাবকে প্রকাশ করবার উপকরণ। শাস্ত্রকারের পরবর্তী লেখকেরা একে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : (১) আলম্বন ও

উদ্দীপন। আলম্বন বিভাব—যে পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও আচরণের দ্বারা স্থায়ী ভাবটিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাকে বলা হয় আলম্বন বিভাব।

উদ্দীপন বিভাব—যে সকল বস্তু, কার্য ও দেশ-কালের প্রভাব উক্ত পাত্র-পাত্রীর হৃদ্‌গত ভাব বা আচরণকে ফুটিয়ে তোলে বা বাড়িয়ে তোলে তাদের বলা হয় উদ্দীপন বিভাব। যেমন রতি বা স্ত্রীপুরুষের অন্যোন্যানুরাগ মাল্যানু-লেপন, গীত-শ্রবণ, জ্যোৎস্নারাত্রি, বসন্তকাল, উপবন আদির দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়।

'অনুভাব'—হৃদ্‌গতভাবের যে নানা বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, যেগুলির যথাযুক্ত অভিনয় দ্বারা নটনটীরা দর্শকগণের নিকট দৃশ্যকাব্যোক্ত চরিত্রগুলিকে জীবন্তবৎ ক'রে তোলে, তাদের বলা হয় অনুভাব। হাস্য, কটাক্ষ, আদি এজাতীয় বাহ্য প্রকাশ। অষ্ট সাত্ত্বিকভাব অর্থাৎ স্তম্ভ (নিশ্চলতা), স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কাঁপুনি), বিবর্ণতা, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা)ও অনুভাবের অন্তর্ভুক্ত।

সঞ্চারী ভাবের অপর নাম ব্যভিচারী ভাব। স্থায়ী ভাব বা মুখ্যভাবের পরিপোষক বা এর বৈচিত্র্য-সম্পাদক হিসাবে যে যে ভাবের আবির্ভাব পাত্রপাত্রীদের আচরণে প্রকাশ পায় তাদের বলা হয় 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারী' ভাব। এরা সংখ্যায় তেত্রিশটি, যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, জাগরণ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক। এই ভাবগুলি সাময়িক। এজন্যেই হয়তো এদের সঞ্চারী ভাবও বলা হয়েছে।

দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা কোনো ভাবকে (যেমন, রতি, হাস্য, শোক আদি) মুখ্যরূপে ফোটাবার জন্যে কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে প্রধান চরিত্র-গুলিই আলম্বন বিভাব, যেমন রাম-সীতার প্রেমবর্ণন-মূলক নাটকে রাম ও

সীতা। তাঁদের প্রেমই (রতি) হ'ল স্থায়ী ভাব বা প্রধান ভাব। উপযুক্ত দেশকাল, পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক নানা বস্তু হ'ল উদ্দীপন বিভাব। সেগুলির অবতারণা দ্বারা রামসীতার প্রেমের ছবি স্ফুটতর হয়ে উঠবে। অনুভাবগুলি (যেমন নায়ক-নায়িকার হাস্য, কটাক্ষনিক্ষেপ আদি) দ্বারা ঘটবে স্থায়ী বা প্রধান ভাবের বাহ্য প্রকাশ। যে তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের কথা বলা হয়েছে তাদের দ্বারা প্রকটিত হবে চরিত্রগুলির বিকাশ এবং তাদের উপর বিভিন্ন ঘটনাচক্রের প্রতিক্রিয়া। দৃশ্যকাব্যের রচয়িতাকে বেশ সতর্কভাবে উল্লিখিত প্রণালীতে গ্রন্থ রচনা করতে হয়। নটনটীরা এ রচনাকে যথাযোগ্য অভিনয়ের সাহায্যে এমন রূপ দিতে পারে যা দর্শকের হৃদয়ে নাট্যে প্রকটিত স্থায়ী ভাবের অনুরূপ ভাব জাগিয়ে তোলে। নাট্যে যদি রাম-সীতার প্রেমই প্রধান প্রতিপাদ্য (স্থায়ী) ভাব হয়, তবে অভিনয় দে'খে নিজের পূর্বানুভূত প্রেমের কথা দর্শকের স্মরণে আসে। এই স্মৃতির ফলে মনে যে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হয় তাকেই বলা হয় 'রস'।[৫] এই রস-সম্ভোগের মাত্রা বিশেষভাবে নির্ভর করে দর্শকের প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতার উপরে। কারণ, যথেষ্ট পরিমাণে সহৃদয় না হলে এবং অভিজ্ঞতা না থাকলে দর্শক নিজকে নটাদির দ্বারা প্রতিরূপিত নায়কনায়িকার অবস্থায় ফেলে তাদের হৃদয়াবেগ ও ভাবনার স্বরূপ উপলব্ধি করার আনন্দ পেতে পারেন না। এরকম উপলব্ধি করতে গিয়ে তিনি নায়কনায়িকার দুঃখকষ্টের আতিশয্য দেখে সত্য সত্যই কেঁদে ফেলতে পারেন অথবা ভয়ের দৃশ্য দেখে তাঁর আতঙ্কিত হওয়াও সম্ভব; কিন্তু এ উভয়স্থলেই তিনি যে রস পাবেন তা উপাদেয়। বাস্তব জীবনে অনুভূত দুঃখ বা ভয়ের সঙ্গে

৫। রস কি, এবং দর্শকেরা নাট্যাভিনয় দে'খে কেমনভাবে রস পেয়ে থাকেন তা নিয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেক বই লিখেছেন। এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

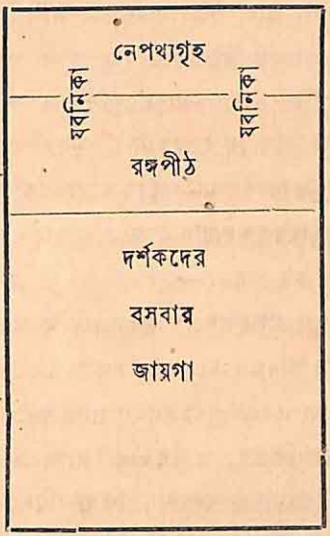
নাট্যযোগে (তথা অন্যান্য শিল্পযোগে) অনুভূত দুঃখ বা ভয়ের তফাৎ এখানে ; একটি রসের কারণ, অপরটি নয়।

রঙ্গমণ্ডপ, সূত্রধার ও নটনটী

নাট্যশাস্ত্রে তিন আকারের নাট্যগৃহ বা রঙ্গমণ্ডপের উল্লেখ আছে, যথা— (১) আয়ত (rectangular), (২) চৌকো (square) ও (৩) ত্রিকোণ। মাপ অনুসারে আবার তাদের বড়ো, মাঝারি, ছোটও বলা হয়। তা হলে মোট নয় রকমের নাট্যগৃহ পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড়ো নাট্যগৃহের এক দিক হবে ১০৮ হাত লম্বা, মাঝারি নাট্যগৃহের ৬৪ হাত, আর সবচেয়ে ছোট গৃহের এক দিক হবে ১৬ হাত। কিন্তু শাস্ত্রে নয় রকম নাট্যশালার কথার উল্লেখ থাকলেও কেবল রাজা-রাজড়ার জন্যেই ৬৪ হাত লম্বা ও ৩২ হাত চওড়া নাট্যগৃহের বিধান। এর চেয়ে বড়ো নাট্যগৃহ মর্ত্যলোকবাসীর জন্যে নয়। কিন্তু আসল কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে। এর চেয়ে বড়ো নাট্যগৃহ হ'লে দর্শকেরা নটনটীর আবৃত্তি, গান ও মুখের ভাবভঙ্গী আদি ভালো ক'রে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। এর চেয়ে ছোট নাট্যশালারও বিধান আছে। সাধারণ মানুষের জন্যে ৩২ হাত × ৩২ হাত মাপের নাট্যগৃহও করা যেতে পারে। সব চেয়ে ছোট নাট্যমণ্ডপ হচ্ছে এক ত্রিকোণ গৃহ যার প্রত্যেক পার্শ্ব ৩২ হাত।

৬৪ হাত × ৩২ হাত মাপের নাট্যশালার রঙ্গপীঠ (রঙ্গমঞ্চ, stage) ও নেপথ্য থাকবে এক ছোট কোনো পার্শ্ব ঘেঁষে। এ স্থানটি হবে ৮ হাত চওড়া ; তার অর্ধেক হবে নেপথ্যগৃহ বা সাজঘর। এখান থেকে নটনটীরা সেজেগুজে রঙ্গপীঠে দেখা দেবে এবং নানা নেপথ্যোক্তি উচ্চারিত হবে। বাকি অর্ধেক স্থান হবে রঙ্গপীঠ। নেপথ্য থেকে রঙ্গপীঠে আসবার দুটি দরজা আছে। তাতে পর্দা (যবনিকা) দেওয়া থাকে। এ পর্দা সরিয়ে পাত্রপাত্রীরা রঙ্গ-

প্রবেশ ও রঙ্গ থেকে প্রস্থান করেন। নিচে ৬৪ হাত×৩২ হাত মাপের নাট্যগৃহের একটি নক্‌শা দেওয়া হ'ল [৬]—



খুব সম্ভব যন্ত্রবাদকেরা কখনো বসতেন রঙ্গপীঠে দুই যবনিকার মাঝে দেয়াল ঘেঁষে, কখনো বা বাজাতেন নেপথ্য থেকে।

নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমণ্ডপ বা নাট্যগৃহ-নির্মাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাভিনয় যে সর্বত্র পাকা পীঠেই হ'ত তা মনে হয় না। কারণ প্রাচীন সাহিত্যে এমন উল্লেখও পাওয়া যায় যে, কোনো কোনো নাটকীয় দল আধুনিক যাত্রাওয়ালাদের মতো দেশ-বিদেশে বেড়াচ্ছে। 'নাটমন্দির' ব'লে যে সকল প্রাচীন গৃহের সন্ধান বা ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় তাদের মধ্যেও কোনো রঙ্গপীঠের সন্ধান কদাচিৎ মেলে না। মনে হয়

৬। এর খুঁটিনাটি এখানে দেওয়া হয় নি। যাঁরা সে সব দেখতে চান তাঁরা Indian Historical Quarterly (vol IX pp. 591-594,)তে গ্রন্থকার-লিখিত The Hindu Theatre প্রবন্ধ দেখতে পারেন।

ভ্রমণকারী নাটকীয় দলই ভারতীয় জনসাধারণের নাট্যদর্শনের ক্ষুধা বেশির ভাগ মেটাত।

নাট্যগৃহের পরেই আলোচ্য সূত্রধার ও তাঁর সহকর্মী নটনটীগণ। এঁদের মধ্যে পদমর্যাদার ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সূত্রধারের স্থান ছিল সবার চেয়ে উঁচুতে। আধুনিক কালে stage-manager বা 'মঞ্চাধ্যক্ষ' বলতে যাকে বোঝায় এঁর গুরুত্ব ছিল তার চেয়ে বেশি। নৃত্য, গীত ও অভিনয়কলার একত্রে সন্নিবেশের হেতু ভারতীয় নাট্যচর্চার মধ্যে যে জটিলতা ছিল তাকে সামলাবার মতো অসাধারণ গুণগ্রাম থাকার দরকার ছিল সূত্রধারের। তাই শাস্ত্রানুসারে সূত্রধারকে হ'তে হবে—

চতুরাতোদ্যকুশলঃ শাস্ত্রকর্মসুশিক্ষিতঃ।
নানা পাষণ্ডকার্যজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ॥
বেশোপচারনিপুণঃ কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।
নানাগতিপ্রচারজ্ঞ রসভাববিশারদঃ॥
নাট্যপ্রয়োগকুশলো নানাশিল্পসমন্বিতঃ।
পাদচ্ছন্দোবিধানজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণ॥
গ্রহনক্ষত্রতত্ত্বজ্ঞো দেহব্যাপারপণ্ডিতঃ।
পৃথিবীদ্বীপবর্ষাণাং পর্বতানাং জলস্য চ॥
প্রমাণচরিতজ্ঞশ্চ রাজবংশপ্রসূতিবিৎ।
শ্রোতা শাস্ত্রার্থকারাণাং শ্রুত্বা চৈবাবধারকঃ॥
অবধার্য প্রবক্তা চ শক্তৈশ্চবোদেশনে।
এবংগুণস্তথাচার্যঃ সূত্রধারো বিধীয়তে॥

চার রকম বাজনায় নিপুণ, নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী কাজে সুশিক্ষিত, নানা ধর্মসম্প্রদায়ের আচরণ সম্বন্ধে অবগত, নীতিশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ, বেশোপচারে ও কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ, নানা নাট্যোক্ত গতি ও চারীব্যাপার ও রসভাবের উপলব্ধিতে দক্ষ, নাট্যপ্রয়োগে কুশল, নানা শিল্পে লব্ধপ্রবেশ, পাদ ও ছন্দের

বিধানে জ্ঞানী, সর্বশাস্ত্রে তথা জ্যোতির্বিদ্যায় শারীরতত্ত্বে, দেশ-জনপদসংস্থানে মানবচরিত্রে ও পুরাণে সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রার্থ যাঁর শোনা আছে আর যিনি সে অর্থ শুনে কর্তব্য নির্ধারণ করতে বা মতামত প্রকাশ করতে ও উপদেশ দিতে পারেন এমন গুণী ব্যক্তিকে সূত্রধার বা আচার্য বলা যেতে পারে।

এ সকল গুণের তালিকা শুনে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, এ রকম দাবি শাস্ত্রকারের বাড়াবাড়ি; কার্যত এমন সর্বগুণসম্পন্ন সূত্রধার মেলা তত সুসাধ্য ছিল না। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হ'লেও শাস্ত্রকারের উক্তি থেকে নিশ্চয় জানা যাচ্ছে যে, সেকালের নাট্যচর্চা নিতান্ত ছেলেখেলা বা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। পাশ্চাত্য নাট্যবিদ্‌গণের কেউ কেউ তাঁদের নাট্যকলা সম্বন্ধেও এরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁদেরও মতে regisseur de la scene (রঙ্গালয়াধ্যক্ষ) খুব গুণী লোক হওয়ার প্রয়োজন আছে। Th. Komisarjevsky বলেন, 'রঙ্গালয়াধ্যক্ষকে কেবল অভিনয়কলায় সুদক্ষ হ'লে চলবে না, পরন্তু যে সকল শিল্পের সংযোগে নাট্য-প্রয়োগ সুসম্পন্ন হয় তাদের সব কটি সম্বন্ধেই তাঁর প্রচুর জ্ঞান থাকা চাই' (A regisseur must be an expert not only as regards acting but in all those arts which together constitute a performance)। কারণ, তিনি মনে করেন উক্ত অধ্যক্ষের কাজ হচ্ছে রঙ্গমঞ্চকে সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে গ'ড়ে তোলা, রঙ্গমঞ্চে নানা শিল্পকে সুসংগত ঐক্য দান করা এবং নটবৃন্দকে পরিচালিত করা (to lead the theatres as institutions of culture, create the sythesis of arts on the stage and to direct the actors)।

পূর্বোক্ত ধরনের সুশিক্ষিত ও গুণী সূত্রধারের 'পারিপার্শ্বিক' ছিল প্রধান সহকারী; এঁরও সূত্রধারের মতো গুণসম্পন্ন হওয়ার বিধি ছিল। এ ছাড়াও সহ-কর্মীরূপে তাঁর দলে থাকত নিম্নোক্ত বারো রকমের লোক—বিদূষক, সাধারণ

নট, নাট্যকার, মুকুটকার, গায়ক, বাদক, আভরণকার, মালাকার, বেশকার, রজক, চিত্রকর, কারুশিল্পী। বিদূষক বলতে সেই লোককে বোঝাত যে বিদূষক-ভূমিকা অভিনয় করতে বা হাস্য-রসসৃষ্টিতে ছিল নিপুণ। আর নাট্যকার নামে ব্যক্তির কাজ ছিল অভিনেতব্য দৃশ্যকাব্যের ভূমিকা যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করা এবং তাদের ঠিকঠাক ভাবে শেখানো। আধুনিক কালের ভাষায় একে বলা যায় 'অভিনয়শিক্ষক'। নাটকীয় দলে মুকুটকার, আভরণকার, রজক, মালাকার, চিত্রকর, কারুশিল্পী ইত্যাদির প্রয়োজন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অভিনয়ের উপযোগী তৈরি সাজসজ্জা সেকালে বয়ে বেড়ানো সুবিধাজনক ছিল না ব'লে, যখন যখন অভিনয় হ'ত তখনকার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি ক'রে নেওয়া হ'ত। নাটকীয় দলে যে সাধারণ নটের কথা আছে তার মধ্যে নটীদেরও ধ'রে নিতে হবে।

প্রাচীন ভারতে মেয়েদের দ্বারাই স্ত্রীভূমিকাগুলি অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক নাটকের প্রস্তাবনাতেই নটীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও যে কোথাও কোথাও না মেলে তা নয়। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকে দেখা যায় যে সূত্রধার নিচ্ছেন সন্ন্যাসিনী কামন্দকীর ভূমিকা, আর পারিপার্শ্বিক নিচ্ছেন তৎশিষ্যা অবলোকিতার ভূমিকা। আবার মেয়েদেরও কখন কখন পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। যেমন 'প্রিয়দর্শিকা' নাটিকায় নাট্যাভ্যন্তর নাটকে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করছে একটি মেয়ে। কিন্তু ভূমিকা-বিতরণে মাঝে মাঝে এরূপ ব্যতিক্রম দেখা গেলেও প্রাচীন নাট্য-পরিচালকগণের সামনে ভূমিকা-বণ্টনের একটি সুচিন্তিত আদর্শ ছিল। যথাযোগ্য পাত্রে ভূমিকা-বিতরণ করা বা না-করা অনুসারে অভিনয়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হত, যেমন—অনুরূপ, বিরূপ ও রূপানুসারী। পুরুষকে পুরুষের ও মেয়েকে মেয়ের, যে যে-বয়সের লোক তাকে সে-বয়সের ভূমিকা দিলে সে হত 'অনুরূপ' অভিনয়। আর যে বালক তাকে বৃদ্ধের ভূমিকা অথবা যে বৃদ্ধ তাকে বালকের ভূমিকা দিলে

তাঁদের অভিনয়কে বলা হত 'বিরূপ'। পুরুষ যদি মেয়েদের ভাব অভিনয় করে বা নারী যদি পুরুষের অভিনয় করে তবে তাকে বলা হয় 'রূপানুসারী' অভিনয়। কিন্তু একাজে কোনো বৃদ্ধ বা চাতুর্যহীন লোককে নিয়োগ করা উচিত নয়। বলা বাহুল্য যে, বিরূপ অভিনয় প্রশস্ত ব'লে গণ্য হ'ত না।

ভূমিকা-বিতরণে যে কেবল বয়োলিঙ্গের বিচারই প্রধান ছিল তা নয়। যারা খুবই প্রিয়দর্শন, অল্পবয়স্ক, খুব দীর্ঘ নয়, স্থূল নয়, কৃশও নয়, উজ্জ্বল চেহারা-যুক্ত ও সুস্বর, এমন লোকদেরই উপযুক্ত মনে করা হ'ত দেবতার ভূমিকা-গ্রহণের। আর যারা খুব দীর্ঘ, স্থূল, ভারি-আওয়াজযুক্ত, স্বভাবত রৌদ্রনেত্র ও ভ্রুকুটীযুক্ত তাদেরই রাক্ষস দানব ও দৈত্যাদির ভূমিকা দেওয়ার বিধান ছিল। সাধারণত যাদের দেবভূমিকা-গ্রহণের উপযুক্ত মনে করা হত প্রায় তাদের সম-শ্রেণীস্থ লোকদেরই দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল রাজা ও রাজকুমারাদির ভূমিকা। যাদের চোখ পিঙ্গল, নাসিকা উচ্চ বা অনুচ্চ কিন্তু দীর্ঘ তাদেরই কঞ্চুকী ও শ্রোত্রিয়াদির ভূমিকা দেওয়া ছিল নিয়ম।

উল্লিখিত স্থলগুলি ছাড়া এমন সব ভূমিকা ছিল যাদের অভিনয়ের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হ'ত। হিন্দুর পুরাণে উল্লিখিত দেবদৈত্যের মধ্যে বহু বাহু, বহু মুখ, বা পশ্বাদির মতো মুখ আছে এমন রূপও বর্তমান। সে-সকলের অভিনয়কালে 'মুখোস' আদির ব্যবস্থা করতে হ'ত। কিন্তু নটনটীগণের মধ্যে যিনি যার ভূমিকাই গ্রহণ করুন তাঁকে মনে মনে ভাবতে হ'ত যে আমি সেই ব্যক্তিই। তাহলেই পরকীয় ভাবটিকে রূপদান সহজ হয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

> "এবং বুধঃ পরং ভাবং সোঽস্মীতি মনসা স্মরন্।
> বাগঙ্গগতিলীলাভিশ্চেষ্টাভিশ্চ সমাচরেৎ ॥"

আহার্য অভিনয়

আগেই বলা হয়েছে যে, গানের কথামাত্র যেমন গান নয়, দৃশ্যকাব্যের গ্রন্থও তেমনি নাট্য নয়। নটনটীরা যদি যথাযোগ্যভাবে অভিনয়দ্বারা এর অন্তর্নিহিত ভাবকে রূপ দিতে পারে তবেই তা সহৃদয় দর্শকদের মধ্যে উদ্‌বোধন করবে রসের। অতএব অভিনয়ই হ'ল নাট্যসম্পর্কে প্রধান কথা। কিন্তু এই অভিনয় কাকে বলে? সাধারণ বাংলাভাষায় এর যে অর্থ আছে নাট্যশাস্ত্রে প্রচলিত বিশেষ অর্থটি তার চেয়ে একটু ব্যাপকতর। দৃশ্যকাব্যবিশেষকে নটনটীরা নাট্যোচিত রূপ দেবার জন্যে যে যে আচরণ করে ও যে যে বস্তুর সাহায্য নেয় তাদের অনেকগুলিকেই অভিনয়ের অঙ্গীভূত ক'রে ধরা হয়। তাই শাস্ত্রকার বলেন যে, অভিনয় চার রকমের—আহার্য, বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক। এই বিভিন্ন প্রকারের অভিনয়ের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তা ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে একটি কথা সকলের আগে স্মরণীয় যে; প্রাচীন ভারতীয় নাট্যে দৃশ্যপটের কোনো স্থান ছিল না। এখানে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তা হলে আখ্যানবস্তুকে বাস্তবের মতো দেখাবার উপযোগী পরিবেশ তৈরি হ'ত কি ভাবে? চোখের সাহায্যে অর্থাৎ পটে আঁকা দৃশ্যের সাহায্যে কোনো দেশ-কালকে প্রত্যক্ষ করাবার চেষ্টার মধ্যে যে একটা শিল্পগত ত্রুটি আছে তার জন্যে আধুনিক পাশ্চাত্য থিয়েটারেও মাঝে মাঝে নূতন ভাবে দৃশ্য-নির্মাণের চেষ্টা হচ্ছে। প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পীরা সেজন্যে আঁকা দৃশ্যপট পরিহার করেছিলেন কিনা তা অনুমান করা শক্ত। তাঁরা দেশকালকে প্রত্যক্ষগম্য করাবার চেষ্টা করতেন মুখ্যত দর্শকদের শ্রবণশক্তির সাহায্যে। সুন্দর অন্তচ্ছন্দময় গদ্যে বা ছন্দোবদ্ধ বাক্যে কবিত্বময় ভাষায় রচিত যে নানা দেশকালের বর্ণনা প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে সে সব দেখে মনে হয় নটনটীদের পেছনে বা পাশে আঁকা চিত্রপট না থাকার দরুন সেকালকার নাট্যদর্শকদের মনে নাটকীয় আখ্যানবস্তুর বাস্তবতা-

সম্বন্ধে মায়া (illusion) জন্মাবার কোনো বাধা হত না। 'মৃচ্ছকটিকে' যে বর্ষার বর্ণনা আছে তার আবৃত্তি শুনলে মনে হয় চোখের সামনে বর্ষার বিচিত্র রূপ দেখতে পাচ্ছি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র প্রথম অঙ্কে কালিদাস রাজার মুখে তপোবনের যে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সহৃদয় দর্শকের সামনে তপোবন-দৃশ্য তার শান্তরস ও গাম্ভীর্য নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়। 'উত্তরচরিতে'র দ্বিতীয়াঙ্কে ভবভূতি রাম ও শম্বূকের মুখে দণ্ডকারণ্যের যে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তার আবৃত্তির পরে সমস্ত গাম্ভীর্য, মাধুর্য, আশ্চর্য এবং ভীষণতা নিয়ে উক্ত বনভূমি শ্রোতার যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উত্তম বর্ণনার সাহায্যে দেশকালকে দর্শকদের প্রত্যক্ষগম্য করবার চেষ্টা শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও রয়েছে। তাঁর উত্তম বর্ণনাশক্তি সম্বন্ধে কোনো সমালোচক বলেন যে (তদীয়) নাটকগুলি এমন-সব বর্ণনায় পূর্ণ যে সে-সকল, রঙ্গসজ্জাকারী চিত্রকর ও অন্যান্য কারুশিল্পীর কৃতিত্বকে নস্যাৎ করে দিতে পারে (The plays are full of such descriptive passages as can nullify the achievements of decorator and mechanic.)। এখানে উল্লেখ থাকা উচিত যে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার যখন রঙ্গালয় পরিচালনা করতেন তখন কোনো দৃশ্যপট ব্যবহারের নিয়ম ছিল না (এমন কি মেয়েদের ভূমিকাও ছেলেদের দ্বারাই অভিনীত হত)। এ নিয়ম যে মন্দ ছিল না তা বুঝতে পারা যাবে কোনো কোনো আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যকলা-বিশেষজ্ঞের উক্তি থেকে, যেমন Th. Komisarjevsky বলেন, "অনেক নাট্যতত্ত্বজ্ঞ বিপরীত রকম ভাবলেও, আঁকা দৃশ্যপট ছাড়াও (নাট্য) প্রয়োগ বেশ ভালো ভাবে চলতে পারে (Contrary to what many theatrical theorists have imagined, a production can do very well without painted scenery)।

আঁকা দৃশ্যপট না থাকলেও রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্রগুলিকে দর্শকদের বোধগম্য করবার জন্যে 'নেপথ্য' বা সাজসজ্জার আনুষঙ্গিক দ্রব্য সমাবেশের

বেশ পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। এই নেপথ্য ব্যবস্থাকে বলা হত আহার্য অভিনয় অর্থাৎ আহরণীয় বস্তুযোগে অভিনয়ের যে অংশ নাট্যের সহায়তা করে। এ নেপথ্যের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গগুলি ছিল: (১) পুস্ত, (২) অলংকার, (৩) অঙ্গরচনা।

(১) রঙ্গভূমিতে আন্‌বার মতো পাহাড়, গুহা, বিমান এবং অশ্বাদির প্রতিরূপ মাদুর, চাটাই, কাপড়, ও চামড়ার সংযোগে তৈরি করা হত; তার নাম ছিল 'পুস্ত'। কৃত্রিম হাত মাথা আদি এবং নানা শ্রেণীর যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাদিও এজাতীয় বস্তুর অন্তর্গত ছিল। রাজশেখরের 'বালরামায়ণে'র অভিনয়ে যন্ত্রপুত্তলিকার, ও রাবণাদির জন্যে কৃত্রিম হাত ও মাথার ব্যবহার অপরিহার্য। রঙ্গমঞ্চে পাহাড়, গুহা, রথ আদির প্রতিকৃতি দেখাবার নিয়ম থাকলেও সব সময়েই যে তা ব্যবহৃত হত এমন মনে হয় না। কোনো কোনো সময় আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারাও ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব বোঝানো হত এরূপ প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে কোন্ নীতি কখন অনুসৃত হত তা ঠিকঠাক জানা যায় না।

(২) পুস্তের পরেই উল্লেখ করতে হয় 'অলংকারে'র কথা। অলংকার বলতে নাট্যশাস্ত্রকারের মতে মাল্য, আভরণ, বস্ত্র এর সব কটিকেই বোঝায়। আর আভরণ বলতে বোঝায়, মুকুট, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, নানা রকমের হার, অঙ্গুলীয় মুদ্রা প্রভৃতি। এসব আভরণ দেবতা এবং রাজাদেরও পরাবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের এ সব তো পরানো হতই তার উপরে পরানো হত শিখাপাশ, মুক্তাজাল, ললাটতিলক, কর্ণবলয়, কর্ণমুদ্রা, কাঞ্চী, রশনা, কিঙ্কিণী-দেওয়া নূপুর আদি। তার উপর পায়ে আল্‌তা পরানোরও ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া অলংকারবৈচিত্র্য, কাপড়ের নানা রঙ ও চুল সাজাবার নানা বৈচিত্র্যের সাহায্যে নারীগণের পরিচয় দেবার রীতি ছিল। বাহুল্যভয়ে সে সবের উল্লেখ করা গেল না। পোশাক পরিচ্ছদ ও আভরণাদি দেখেও সে কালকার নাট্যদর্শক সামাজিকগণ বুঝতে পারতেন নট বা নটী যক্ষীর অভিনয় করছে, না নাগকন্যার অভিনয় করছে। মুনিকন্যা, সিদ্ধাঙ্গনা, গন্ধর্বী, রাক্ষসী বা

দেবলোকবাসিনীদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ তাও বস্ত্রালংকার ও সজ্জা-বৈচিত্র্য দ্বারা বোধগম্য করার রীতি ছিল।

(৩) এসবের উপর ছিল নটনটীদের অঙ্গরচনা। অঙ্গরচনার এক প্রধান অংশ ছিল মুখ হাত আদিতে রঙ মাখানো অর্থাৎ একালের ভাষায় যাকে বলে 'পেন্টিং'। সেকালকার পেন্টিংএ যে প্রধান রঙগুলি ব্যবহৃত হত উপাদানসমেত তাদের নাম নিচে দেওয়া যাচ্ছে—

পাণ্ডুবর্ণ = নীল + শ্বেত,
পদ্মবর্ণ = রক্ত + শ্বেত,
হরিৎ (সবুজ) = নীল + পীত,
কাষায় = নীল + রক্ত,
গৌর = রক্ত + পীত।

বলা বাহুল্য রঙ মাখানোর ফলে এক এক ব্যক্তিতে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আরোপ সহজতর হত। যেমন বেশ-ভূষার সাহায্যে তেমনি রঙের সাহায্যেও নানা বিশেষ জাতি বা ব্যক্তি বোঝানো হত। যথা, সাধারণ দেবতাদের ও অপ্সরাদের রঙ করা হত গৌর। তবে রুদ্র, ব্রহ্মা, স্কন্দকে দেওয়া হত সোনালি রঙ; চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি, বরুণ, তারাগণ, সমুদ্র, হিমবান্ ও গঙ্গাকে সাদা রঙ, মঙ্গলগ্রহকে লাল রঙ, বুধ ও অগ্নিকে হল্‌দে রঙ, নারায়ণ, নর, বাসুকি, দৈত্য, দানব, রাক্ষসাদিকে শ্যামবর্ণ, আর যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও বানরাদিকে তপ্তকাঞ্চনের রঙ দেওয়ার বিধি ছিল।

এরূপ কেবল দেবলোকবাসী নয় মর্ত্যলোকের অধিবাসীদেরও নানা রঙের সাহায্যে পরস্পরের বিভিন্নতা বোঝানো হত। সেকালকার নাট্যদর্শক সামাজিকেরা রঙ দেখে বুঝতে পারতেন নট, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পাঞ্চাল ওড্র মগধাদি কোন দেশের, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের, অথবা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ভিক্ষু আদি কোন্ আশ্রমীর অভিনয় করছে।

অঙ্গরচনার আরেক অংশ ছিল শ্মশ্রুকর্ম বা গোঁফদাড়ির ব্যবহার। এ

জিনিসটি দেওয়া হত চার রকমের: সাদা, অপরিষ্কার, বিচিত্র ও রোমশ। রাজামাত্য, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতাদির দাড়ি হত সাদা, দুঃখীলোক ও তপশ্চর্যা-পরায়ণ লোকদের দাড়ি হত অপরিষ্কার, আর ঋষিদের ও বিদ্যাধরাদির দাড়ি রোমশ,। 'বিচিত্র' দাড়ির অর্থ আধুনিক কালের ভাষায় হবে 'স্মার্ট' দাড়ি-গোঁফ। রাজা, রাজকুমার, রাজপুরুষ ও বিলাসী যুবকদের জন্যে ছিল এর ব্যবস্থা।

উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়া সাজসজ্জার ব্যাপারে মুখোস ব্যবহারের নিয়ম ছিল। বিশেষভাবে দৈত্য রাক্ষস আদির ভূমিকা ধারণের বেলায় তদুপযোগী নানা মুখোস ব্যবহার করা হ'ত।

বাচিক অভিনয়

আহার্য অভিনয় বা যথাযোগ্য সাজসজ্জাদির ব্যবহার দ্বারা নাটকীয় চরিত্র-গুলির বাহ্যিক পরিচয় প্রকাশিত হয়; সেটিকে আরো দৃঢ় করে বা যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের কথাবার্তা। বাচিক অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা নটনটী উক্ত চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত ভাবকে অনেকটা সুস্পষ্ট রূপ দান করে। এই বাচিক অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য সেকালকার নাট্যপরিচালকগণের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। যে সকল ভাষার কথা আবৃত্তি করতে হবে তাদের গঠন না জানলে আবৃত্তির দোষগুণ বোঝা যায় না। এজন্যে নাট্যশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থূল বিষয়গুলির উল্লেখ আছে এবং প্রধান প্রাকৃতের (শৌরসেনীর) লক্ষণও আলোচিত হয়েছে। আর ঠিক অনুরূপ কারণে নানা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের লক্ষণ উদাহরণ সহ সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে এ শাস্ত্রে। এ গুলির উদ্দেশ্য এই যে, নাট্য-পরিচালকগণ যেন বাচিক অভিনয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ জাতীয় সতর্কতা অবলম্বন করলেও আবৃত্তি সম্পূর্ণ

নাট্যোপযোগী হয় না। সেজন্যে আবৃত্তিতে যথাযোগ্য সুর-আরোপণের (intonation) কৌশল জানা চাই। ঐ কৌশল জানা থাকলেই আবৃত্তি পাঠ্যগুণ-সম্পন্ন বিবেচিত হত। পাঠ্যগুণের বিবেচনায় সাতটি সুর (= স্বর), তিনটি স্থান, চারটি বর্ণ (স্বরক্রম) আদি বিচার্য। বাক্যের অন্তর্গত অর্থ, রস ও ভাবাদির বৈচিত্র্যহেতু এ সকলের তারতম্য হয়। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে—

সুর—সুর সাতটি :—সা, রে, গা, মা পা ধা নি (=ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ)। হাস্য ও শৃঙ্গার রসের আবৃত্তিতে মা, পা হবে সুর ; করুণে গা ও নি ; রৌদ্রে ও বীররসে সা এবং রে ইত্যাদি।

স্থান—তিনটি স্থানের ফল তার, উদার, ও মন্দ্র সুর। দূরের কাউকে ডাকতে তার-স্বরের (খুব উঁচু গলার), অল্পদূরের কাউকে কিছু বলতে উদার সুরের (সাধারণ কণ্ঠের), আর খুব কাছের লোককে কিছু বলতে মন্দ্র সুরের (মৃদু সুরের) ব্যবহার হবে।

বর্ণ—বর্ণ বা স্বরের প্রকৃতি চার রকমের : উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত। উচ্চস্বরকে বলে উদাত্ত, অনুচ্চস্বরকে অনুদাত্ত, উভয়ের মাঝামাঝিকে বলে স্বরিত; আর কম্পিত স্বরের অর্থ রয়েছে তার নামের মধ্যেই।

হাস্য ও শৃঙ্গার রসের আবৃত্তিতে বর্ণগুলি হবে স্বরিত ও উদাত্ত ; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের আবৃত্তিতে উদাত্ত ও কম্পিত, করুণ, বাৎসল্য ও ভয়ানকের বেলায় উদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত বর্ণ ব্যবহার করতে হবে। এ সব ছাড়াও আবৃত্তির অন্য খুঁটিনাটি নিয়ম ছিল। বাহুল্যভয়ে সে সকল আলোচিত হল না। এ গুলি প্রয়োগকালে কেমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হত তা স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবে শাস্ত্রকারের প্রদত্ত ব্যবস্থা থেকে এটি বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নটনটীদের আবৃত্তিতে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য দান করবার জন্যে গীতকলা প্রয়োগেরও বাধা ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার এ ব্যবস্থাটির সঙ্গে য়ুরোপীয় 'ক্লাসিক অ্যাক্‌টিং'এর কিয়দংশে মিল ছিল ব'লে মনে

হয়। সেখানেও কবিতা আবৃত্তিকে ইচ্ছা ক'রে গানের সুরে (deliberate musical recitation in speaking verse) করা হত। এরূপ ব্যবস্থার ফলে গদ্য এবং পদ্য রচনার সুরলয়-সহকৃত ভাবরস-ময় আবৃত্তি সমগ্র নাট্যের অন্তশ্ছন্দকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করবার সাহায্য করত।

আঙ্গিক অভিনয়

আঙ্গিক অভিনয়ের মোটামুটি মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে বাক্যগুলির অন্তর্গত পদসমূহের অর্থকে সহজবোধ্য ক'রে তোলা। সাধারণ কথাবার্তায়ও অঙ্গভঙ্গী ব্যবহার করা হয়, কিন্তু হৃদয়াবেগের স্ফুরণ না ঘটলে এ অঙ্গভঙ্গী সহজে লক্ষ্যগোচর হয় না। তা সত্ত্বেও জাতিভেদে কথাবার্তার কালে অঙ্গভঙ্গীর কিছু তারতম্য দেখা যায়। যেমন ভারতবর্ষের দ্রাবিড় জাতির লোকদের মধ্যে, য়ুরোপের 'লাতিন' (Latins) ও 'কেল্ট্‌দের' (Celts) মধ্যে অঙ্গভঙ্গীর ব্যবহার খুব বেশি। এদিক দিয়ে 'নর্ডিক' (Nordic) জাতের লোকদের আপেক্ষিক স্থির ভাব লক্ষ্য করবার মতো। অবশ্য এ ব্যাপারে ঐতিহ্যধারা এবং শিক্ষার প্রভাবও নগণ্য নয়। খুব সম্ভব জন্মগত প্রভাবের চেয়ে সংস্কৃতিগত প্রভাবই এখানে প্রবল। সে যাই হোক্, নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন ও শোভনতা সর্ববাদীসম্মত। জগতের সব দেশের সব কালের নাট্যেই বোধ হয় অভিনয়ের ব্যবহার লক্ষ্যগোচর হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অভিনয় প্রয়োগের ধরণটি সর্বত্র সমান নয়। ভারতীয় নাট্যকলায় আঙ্গিক অভিনয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করলেই এ জিনিসটি বোঝা যেতে পারে।

আঙ্গিক অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গীকে নাট্যশাস্ত্রকার তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা মুখজ, চেষ্টাকৃত এবং শারীর। 'মুখজ' অভিনয়ের মধ্যে পড়ে শির ও চক্ষু আদির বিবিধ সঞ্চালন ও অবস্থা। শির বা মাথার অভিনয় তেরো

রকমের : আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত। একে একে প্রয়োগসহ এদের কয়েকটির লক্ষণ নির্দেশ করা যাচ্ছে—

আকম্পিত—আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে মাথাকে উঁচুনিচু করা। প্রয়োগ—কোনো বস্তুর জ্ঞান হলে, কাউকে উপদেশ দানে, প্রশ্ন করবার সময় বা স্বাভাবিক বাক্যালাপের কালে, কাউকে নির্দেশ দিতে।

কম্পিত—তাড়াতাড়ি মাথাকে ক্রমান্বয়ে উঁচুনিচু করা। প্রয়োগ—ক্রোধে, বিতর্কে, প্রতিজ্ঞা বা তর্জনের কালে, ব্যাধি বা ক্ষমাহীনতার অভিনয়ে।

ধুত—মাথাকে ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া। প্রয়োগ—অনিচ্ছায়, বিষাদে, বিস্ময়ে পাশের দিকে তাকানো, শূন্যভাবে, প্রতিষেধে।

বিধুত—মাথাকে খুব তাড়াতাড়ি ডাইনে বাঁয়ে নাড়া। প্রয়োগ—শীতগ্রস্ত, ভয়ার্ত, জ্বরযুক্ত লোকের এবং সদ্য মদ খেয়েছে এমন লোকের অভিনয়ে।

পরিবাহিত—মাথাকে একবার এপাশে একবার ওপাশে করা। প্রয়োগ—সাধনকালে, বিস্ময়ে, হর্ষে, ক্ষমাহীনতায়, বিচারে, ক্রীড়ায়, বিহারে।

উদ্বাহিত—মাথাকে একবার উপরের দিকে তুলে আবার সমানভাবে রাখা। প্রয়োগ—সগর্ব ইচ্ছা প্রদর্শনার্থে, উর্ধ্ব-নিরীক্ষণে, ও নিজের মান প্রকাশ করতে।

অবধুত—একবার মাথাকে নত করে আবার সমানভাবে রাখা। প্রয়োগ—কাউকে আহ্বান, আলাপ ইত্যাদির বেলায়।

অঞ্চিত—গ্রীবাকে পাশের দিকে কিঞ্চিৎ নত করা। প্রয়োগ—ব্যাধি, মূর্ছা, মত্ততা, চিন্তা দুঃখাদির অভিনয়ে।

নিহঞ্চিত—দুই বাহু এবং মস্তক উপরের দিকে তুলে গ্রীবাকে ঈষৎ পাশের দিকে হেলানো। প্রয়োগ—স্ত্রীদের গর্বে, বিলাসে, লীলাদিতে।

পরাবৃত্ত—মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকানো। প্রয়োগ—মুখাপসারণে, পিছনের দিকে তাকানোতে।

উৎক্ষিপ্ত—মাথা উঁচু ক'রে উপরের দিকে, তাকানো। প্রয়োগ—উচ্চ বস্তু দর্শনে, দিব্যাস্ত্রাদির ব্যবহারে।

অধোমুখ—মাথা নিচু ক'রে রাখা। প্রয়োগ লজ্জায়, প্রণামে ও দুঃখে।

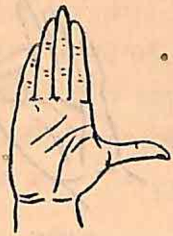
লোলিত—মাথাকে সব দিকে ঘোরানো ফেরানো। প্রয়োগ—মূর্ছা, ব্যাধি, মদাবেগ আদিতে।

শিরঃকর্মের পরেই আলোচ্য দৃষ্টিভেদ। দৃষ্টি ছত্রিশ রকমের: কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রা, বীরা, বীভৎসা, স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা, বিস্মিতা, শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, ম্লানা, শঙ্কিতা, বিষণ্ণা, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, ললিতা, বিতর্কিতা, অর্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, ত্রস্তা, মদিরা।

প্রায় নাম দেখেই একয়টি দৃষ্টির স্বরূপ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে; তাই বাহুল্য পরিহার করার ইচ্ছায় এদের লক্ষণাদি দেওয়া হল না।

মুখজের পরেই আঙ্গিকাভিনয়ের 'চেষ্টাকৃত' নামক বিভাগ। এ চেষ্টাকৃত অভিনয় বিশেষভাবে হস্তাভিনয়েরই নাম। কারণ, মানুষের চেষ্টা হাতের দ্বারা যেমন প্রকাশ লাভ করে তেমন বোধ হয় আর কিছুর দ্বারাই নয়। আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্যে তাই হস্তাভিনয়ের বা হস্ত দ্বারা অভিনয়ের স্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হস্তাভিনয়ে হাত দু'রকমে ব্যবহার করা হয়। তাদের নাম অসংযুত ও সংযুত।

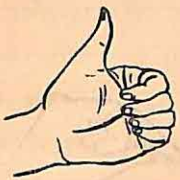
'অসংযুত' হস্ত মানে শুধু একখানি হাত। 'সংযুত' হস্ত মানে পরস্পর মিলিত দুখানি হাত। অসংযুত হস্ত চব্বিশ রকমের: পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ,



অর্ধ চন্দ্র



অরাল



শিখর



কপিথ



পদ্মকোশ



চতুর



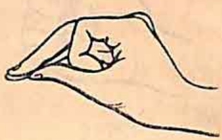
ভ্রমর



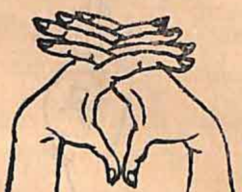
হংসাস্য



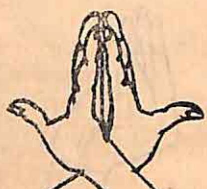
হংসপক্ষ



তাম্রচূড়



কর্কট



স্বস্তিক

সন্দংশ, মুকুল, উর্ণনাভ, তাম্রচূড়। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে নিচে এদের কয়েকটির মাত্র লক্ষণ ও প্রয়োগ দেওয়া হল।

পতাক—যে হাতের অঙ্গুষ্ঠ ছাড়া আঙ্গুলগুলি প্রসারিত ও পরস্পর সংলগ্ন, এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত। প্রয়োগ—প্রহার, প্রতাপ, প্রেরণাদান আদি অভিনয়ে। 'আমি' একথা ব'লে গর্বপ্রকাশের সময় পতাক্-হস্ত ললাটদেশে স্থাপন করতে হবে। 'এই' আগুন, বর্ষাধারা, পুষ্পবৃষ্টি আদির অভিনয়েও পতাকহস্ত ব্যবহার্য।

ত্রিপতাক—পতাক-হস্তে অনামিকা বক্র হলে তাকে বলা হবে ত্রিপতাক। প্রয়োগ—আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, বারণ, প্রবেশ, প্রণাম, মাঙ্গল্য দ্রব্যাদির স্পর্শ, উষ্ণীষ-ধারণ ইত্যাদি কার্যে।

কর্তরীমুখ—ত্রিপতাক হস্তে যদি তর্জনী মধ্যমার পৃষ্ঠদেশের দিকে হেলানো হয় তবে তাকে কর্তরীমুখ হস্ত বলা হয়। প্রয়োগ—পথিক, চরণ, পতন, মরণ ইত্যাদির অভিনয়ে।

মুষ্টি—যে হস্তের অঙ্গুলিগুলির অগ্র করতলে ও অঙ্গুষ্ঠ তদুপরি স্থাপিত তাকে মুষ্টি হস্ত বলা হয়। প্রয়োগ—প্রহার, ব্যায়াম, নির্গম, হস্তপীড়ন, সংবাহন ইত্যাদিতে।

শিখর—মুষ্টিহস্তের অঙ্গুষ্ঠ যদি উর্ধ্ব-প্রসারিত হয় তবে তাকে শিখর বলা হয়। প্রয়োগ—রশ্মি, কুশ ও ধনু ধারণে, তোমর ও শক্তি মোচনে, অধরোষ্ঠ ও পাদরঞ্জনে।

কপিত্থ—শিখর হস্তের তর্জনী যখন অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়িত হয় তখন তাকে কপিত্থ বলা হয়। প্রয়োগ—অসি, বাণ, চক্র তোমর, কুন্ত, বজ্র, বাণ আদি শস্ত্রের অভিনয়ে।

সংযুত হস্ত তেরো রকমের: অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, খটকা-বর্ধমান, উৎসঙ্গ, নিষধ, দোল, পুষ্পপুট, মকর, গজদন্ত, অবহিত্থ, বর্ধমান। সংক্ষেপে এদের কয়েকটির লক্ষণাদি দেওয়া হল।

অঞ্জলি—দুটি পতাকহস্তকে মিলিত করলে অঞ্জলি হস্ত হয়। প্রয়োগ—দেবতা, গুরু ও মিত্রকে অভিবাদনকালে। দেবতার প্রণামে অঞ্জলি মাথায়, গুরুপ্রণামে মুখের নিকটে ও মিত্রের অভিবাদনে বক্ষে ধারণ করবে।

কপোত—দুটি হাত যদি পরস্পরের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করে তবে তাকে কপোত হস্ত বলা হয়। প্রয়োগ—বিনয় প্রদর্শনে, প্রণাম করণে, গুরুর সঙ্গে আলাপে। স্ত্রীগণের পক্ষে শীত বা ভয় অভিনয়ে বক্ষোদেশে কপোত হস্তকে কাঁপানো কর্তব্য।

খটকা-বর্ধমান—খটকা (-মুখ) হস্তকে খটকা (-মুখ) হস্তের উপর রাখলে খটকাবর্ধমান হস্ত হবে। প্রয়োগ—শৃঙ্গারার্থে ও প্রণাম করণে।

'শারীর' অভিনয় অর্থে বক্ষোদেশ, উদর, পার্শ্ব, কটী, উরু, জঙ্ঘাদির অভিনয় বোঝায়। বাহুল্যভয়ে এদের নামাদির উল্লেখ করা হল না।

জঙ্ঘা, উরু, কটী ও পদের যুগপৎ সঞ্চালনের নাম 'চারী'। যুদ্ধাভিনয়ে ও গতিতে সর্বত্র চারীর ব্যবহার হয়ে থাকে। চারী ভৌম ও আকাশিকী ভেদে দু'রকমের। ভৌম চারীর সংখ্যা ষোলো, আর আকাশিকী চারীর সংখ্যাও ষোলো।

চারীর সঙ্গে সঙ্গে 'স্থানে'র কথাও আলোচ্য। বিবিধ দাঁড়ানোর ভঙ্গীর নাম স্থান। স্থান ছয় রকমের: বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, ঐন্দ্র, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়। বাহুল্যভয়ে কেবল বৈষ্ণব ও সমপাদ স্থান সংক্ষেপে বর্ণিত হল:

বৈষ্ণব—পা-দুখানি আড়াই তাল অন্তরে থাকবে। একখানি পা থাকবে সোজা আরেকখানি হবে (ঈষৎ) বাঁকানো। এমতাবস্থায় শরীরে সৌষ্ঠবাঙ্গ বর্তমান থাকলে তাকে বলা হয় 'বৈষ্ণব' স্থান। প্রয়োগ—স্বাভাবিক কথাবার্তায়, চক্রমোক্ষণ এবং ধনুর্ধারণ ইত্যাদিতে।

সমপাদ—পাদদ্বয় এক তাল অন্তরে থাকবে এবং শরীরে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব থাকবে। প্রয়োগ—পক্ষী, ব্রতচারী সন্ন্যাসী আদির অভিনয়ে।

অভিনয়কালে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চলাফেরার ও অবস্থানের জন্যে ছিল চারী, মণ্ডল ও স্থান অবলম্বন করবার বিধি। কিন্তু পাত্রপাত্রীদের রঙ্গপ্রবেশ ও রঙ্গ থেকে নিষ্ক্রমণের কালে বিশেষ ভাবে পদচালনা করবারও নিয়ম ছিল। এ পদচারণের রকম দেখে বোঝা যেত, কে কোন শ্রেণীর পাত্র। যেমন, দেবতা ও রাজারা চার তাল অন্তরে পদক্ষেপ করতেন, মধ্যম পাত্রেরা দু তাল অন্তরে পা ফেলতেন, আর স্ত্রীজন ও অপরাপর লোকে এক তাল ক'রে পা বাড়াত। তার মধ্যে দেবতাদি উত্তম পাত্রপাত্রীরা সমস্ত পদতলকে ভূমিস্পর্শ করাতেন, মধ্যম পাত্রপাত্রীরা পদতলের অর্ধভাগকে মাটিতে লাগাতেন, আর নীচ পাত্রপাত্রী অর্থাৎ দাসদাসীদের পায়ের এক চতুর্থাংশ মাত্র মাটিতে ছোঁয়াবার নিয়ম ছিল। এদের সকলের গতিবেগেরও সীমা সম্বন্ধে বাঁধাবাধি ছিল, যেমন উত্তম পাত্রপাত্রী ধীরে ধীরে চলবেন, মধ্যম পাত্রপাত্রীর মধ্যগতিতে ও অধম পাত্রপাত্রীর দ্রুতগতিতে চলার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য স্বচ্ছন্দ গমনের বেলায়ই ছিল পূর্বোক্ত নিয়ম। ব্যতিব্যস্ত হবার কারণ ঘটলে, কোনো দৈবদুর্বিপাক ঘটলে বা রাগের কারণ ঘটলে এ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হত। আর ভিন্ন ভিন্ন রসের এবং অবস্থাবিশেষের অভিনয়েও গতির পরিবর্তন ঘটত। যেমন, করুণরসের অভিনয়ে গতি সংযত করবার ব্যবস্থা ছিল।

সাত্ত্বিক অভিনয়—নানা শারীরিক অবস্থার যে অভিনয় তাকেই বলা হয় 'সাত্ত্বিক'। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সত্ত্ব গুণের সঙ্গে এ অভিনয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন,

"দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং।"

অর্থাৎ 'সত্ত্ব' হচ্ছে দেহমূলক বস্তু। সাত্ত্বিক অভিনয়কে স্থূলদৃষ্টিতে আঙ্গিকেরই অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। সাত্ত্বিকভাব আটটি। স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ, স্বরসাদ (=স্বরভঙ্গ), মূর্ছা। বাহুল্যভয়ে এদের কয়েকটির মাত্র লক্ষণসহ অভিনয়পদ্ধতি নিচে দেওয়া গেল।

ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, লজ্জা দুঃখ, শ্রমাদির জন্যে ও ব্যায়াম ক্লান্তির ফলে শরীরের স্বেদ বা ঘর্ম দেখা দেয়। হাতে পাখা নিয়ে, ঘাম মুছে বা বাতাস পাওয়ার ইচ্ছা বুঝিয়ে স্বেদ বা ঘর্মোদ্গম অভিনয় করবে।

আনন্দে, ক্রোধাতিশয্যে, ধূম বা অঞ্জন লাগলে, হাই তুলতে, ভয়ে, শোকে, বা বহুক্ষণ একদিকে অপলকে চেয়ে থাকলে, চোখের জল (অশ্রু) বার হয়।

চোখ মুছে বা চোখের জল ফেলে অশ্রু অভিনয় করবে (নেত্রসংমার্জনৈর্বাষ্পৈরশ্রু ত্বভিনয়েদ্)।

যে সকল যৌবনসুলভ আন্তরিক ভাব প্রকাশ দ্বারা মেয়েরা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে তাদের অভিনয়কে সাত্ত্বিক অভিনয়ের মধ্যে ফেলা হয়েছে। এগুলিকে 'যোষিদলংকার' বা স্ত্রীজাতির শোভাসম্পাদক বলা হত। এ যোষিদলঙ্কার কুড়ি রকমের: ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য, ধৈর্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিহৃত। বাহুল্যভয়ে এদের লক্ষণ আলোচনা করা গেল না।

নৃত্য ও নৃত্ত

নাট্যের সঙ্গে নৃত্যের যে ঘনিষ্ঠ যোগ তা বুঝতে হলে নৃত্য ও নৃত্ত শব্দের অর্থ বোঝা দরকার। নাট্যশাস্ত্রকার 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত' নামে দু রকম বস্তুর উল্লেখ করেন নি। যে কোনো রকম নাটকেই তিনি বলেছেন 'নৃত্ত'। খুব সম্ভব নৃত্তের দুরকম ভেদকে বোঝাবার সুবিধার জন্যে পরবর্তীকালে [১]

---

[১] ধনঞ্জয়ের দশরূপক গ্রন্থ এ সময়ের। কোনো কোনো পরবর্তী গ্রন্থকার স্বসম্প্রদায়ের রীতি অনুসরণ করেই হোক আর ভারতের নাট্যশাস্ত্র না বুঝতে পেরেই হোক নৃত্ত ও নৃত্যের ভেদ সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

'নৃত্তে'র সঙ্গে সঙ্গে 'নৃত্য' কথাটিরও চলন হয়। তখন থেকে 'নৃত্ত' বলতে বোঝাত শুধু অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ বা সবিলাস অঙ্গচালনা (artistic movement of limbs)। এ অঙ্গচালনাকে আরো আকর্ষণযোগ্য করবার জন্যে নাচের সময় বাদ্যানুসারী তাল ও লয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হত [৮]। নৃত্তের অর্থ যখন থেকে সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল তখন থেকে 'নৃত্য' শব্দের অর্থ দাঁড়াল ভাবের অভিনয় [৯] বা অঙ্গের বিক্ষেপাদির সাহায্যে ভাবের প্রকাশ। এ নৃত্যের বেলায় বাজনার কোনো প্রসঙ্গ নেই। নৃত্যের সময়েও অভিনয় আছে, আর নাট্যের বেলায়ও অভিনয় আছে ; কাজেই এখানে জিজ্ঞাসা হতে পারে নৃত্য ও নাট্যে তফাৎ কোথায় ? নাট্য হচ্ছে দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত কোনো পাত্রপাত্রীর অবস্থা (ভাব, ভাষা আদি) অনুকরণ [১০] আর নৃত্য হচ্ছে কোনো গানের বা কবিতার অন্তর্গত বা নর্তকের কল্পিত ভাবকে রূপদান [১১]। নাট্যের দ্বারা দর্শকের প্রাণে হয় রসের সঞ্চার, আর নৃত্য দ্বারা ঘটে তাঁর হৃদয়ভাবের উদ্বোধন। অবশ্য এই হৃদয়ভাবের উদ্বোধন দ্বারা পরোক্ষভাবে রসের আস্বাদন সহজতর হয়, এজন্য কোনো কোনো পরবর্তী গ্রন্থকার নৃত্যকে 'রসযুক্ত' ব'লেও উল্লেখ করেছেন। এঁদের মতে নৃত্য ও নাট্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। মনে হয় প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো নটসম্প্রদায় নাট্য ও নৃত্যকে সমার্থক মনে করতেন। নেওয়ারী ভাষায় 'হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য' নামক একখানি নাট্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। সে যাই হোক উপস্থিত আলোচনায় বোঝবার সুবিধার জন্য 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত' এই দুটি সংজ্ঞাই ব্যবহৃত হবে।

---

(৮) নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্—দশরূপক

(৯) অন্যদ্ ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং—দশরূপক

(১০) অবস্থানুকৃতির্নাট্যং—দশরূপক

(১১) ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং—দশরূপক

নৃত্য, নৃত্ত ও নাট্য এ তিনেরই সাধারণ নাম দেওয়া যেতে পারে 'নাচ'; কারণ সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের ব্যাপার এর সব কটিতেই বিদ্যমান। আঙ্গিক অভিনয়ের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া গিয়েছে তা থেকে হয়ত স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, শুধু নানা পদার্থ (meaning of words) প্রকাশ করবার জন্যে অবলম্বিত অঙ্গভঙ্গী কিরূপে নাচ ব'লে গণ্য হতে পারে। এটি বুঝতে একটু আয়াস দরকার হবে। এখানে উল্লেখ থাকা উচিত যে প্রাচীন ভারতের নাট্যকলায় স্বাভাবিক ও প্রথানুসারী দুরকম ব্যবহারেরই স্থান ছিল। শাস্ত্রকার স্বাভাবিককে বলেছেন 'লোকধর্মী' (popular, pantominic) আর প্রথানুসারীকে নাম দিয়েছেন 'নাট্যধর্মী' (theatrical, according to the convention of the theatrical art, pictorial)। চার রকম অভিনয়েও খানিকটা ছিল লোকধর্মী আর খানিকটা ছিল নাট্যধর্মী। যেমন, অসংযুত হস্তের অভিনয়ে যে অর্ধচন্দ্র-হস্ত দ্বারা ছোটো গাছ, ও কোনো জিনিসের স্থূলত্ব বোঝানো হয়, এটা লোকধর্মী। আর কর্তরীমুখ হস্ত দ্বারা যে পথিক, চরণ ও শৃঙ্গ বোঝায় তা নাট্যধর্মী। এ নাট্যধর্মী আঙ্গিক অভিনয়ের উদ্দেশ্য শোভাবর্ধন। এ দুয়ের সুসমঞ্জস মিলন সাধন করাই ছিল সেকালের সূত্রধারের কাজ। কথা বলবার সময়ে অঙ্গভঙ্গীর কাজ হচ্ছে অভিপ্রেত অর্থকে স্পষ্টতর করা বা তার উপর জোর দেওয়া। কোনো বিশেষ বিষয়কে বক্তার বুদ্ধিগোচর করবার উদ্দেশ্যে যখন কথা বলা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী থাকলে বাক্যপ্রবাহ লীলায়িত হয়ে ওঠে, আর বাক্যে যখন ভাবাবেগ প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী থাকলে বাক্য অলংকৃত হয়ে শোভা ধারণ করে। এ কারণে উক্ত উভয় প্রকার বাক্য-প্রয়োগেই লোকধর্মী এবং নাট্যধর্মী অঙ্গভঙ্গী বর্তমান থাকতে বাধ্য। ওরূপ অঙ্গভঙ্গীর ফলে নাটকান্তর্গত দৃশ্যগুলি চিত্রের মতো ক্রিয়া (pictorial effect) উৎপাদনে সাহায্য করে। নাচ যে সৌন্দর্য উৎপন্ন করে তার মূল কারণ মনুষ্য দেহের ছন্দোময় (rhythmical)

চালনা। কেউ কেউ এজন্যে নাচকে 'দেহের গান' (যেমন সাধারণ গীত হচ্ছে কণ্ঠস্বরের গান) বলেছেন। কাজেই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে সাধারণ ভাব-প্রকাশক অঙ্গভঙ্গী বা অভিনয়কেও নাচ ক'রে তোলবার সজ্ঞান প্রয়াস ছিল। এই হ'ল অভিনয়মূলক নাচ। এছাড়াও ছিল কেবল শোভাসম্পাদক নৃত্ত এবং ভাবমাত্র প্রকাশক নৃত্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলায় এদের ব্যবহার ছিল কোথায় ?

শোভাসম্পাদক নৃত্তের ব্যবহার ছিল পূর্বরঙ্গের অর্থাৎ নাট্যারম্ভের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে। এ সম্বন্ধে পরে বলা হবে। আর নৃত্যের ব্যবহার ছিল দৃশ্য-কাব্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে, প্রয়োগানুসারে। এর প্রয়োজন ছিল নাট্যান্তর্গত গানগুলির অর্থকে স্ফুটতর কর। প্রাচীন ভারতীয় নাটকের গানগুলি প্রায়শ সংস্কৃতেই রচিত হ'ত। কখনো প্রাকৃত গানও দেখা যায়। কিন্তু এ গানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে প্রকাশ্যভাবে গান বলে উল্লিখিত না হলেও প্রাচীন দৃশ্যকাব্যগুলির অন্তর্গত পদ্য উক্তিপ্রত্যুক্তি গুলিকে গান মনে করাই উচিত; কারণ সেগুলি সুরলয় সহকারে পড়বারই ব্যবস্থা ছিল। সে হিসাবে সেগুলি গান ছাড়া আর কি ? এ সকল ছাড়াও অভিনয়ের সময় পাত্রপাত্রীদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণাদি কালে 'ধ্রুবা-গীত' নামক এক শ্রেণীর গান গাওয়া হত। সেগুলির অন্তর্নিহিত ভাবও হয়তো সময় সময় নাচের দ্বারা প্রকাশিত হত।

পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তা ও অভিনয় হতে হতে মাঝে মাঝে নাচের প্রয়োগ দেখে অনেকে হয়ত প্রাচীন নাট্যকলাকে অস্বাভাবিক ব্যাপারের আধিক্যবশত কৃপার চোখে দেখতে পারেন, কিন্তু তা হ'লে তাঁদের ধৈর্য ও রসজ্ঞতার প্রশংসা করা যাবে না।

নাট্যকলায় যাঁরা পদে পদে স্বাভাবিকতা খোঁজেন তাঁদের এটা মনে রাখা উচিত যে যখন থেকে আধুনিক নাট্যকলা গ্রীক নাট্যশাস্ত্রে নির্দিষ্ট স্থানগত ও কালগত ঐক্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম শিথিল করেছে

তখন থেকে স্বাভাবিকতার দাবিও শিথিল হতে বাধ্য। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ শিল্পের মতো নাট্যাভিনয়েরও উদ্দেশ্য মানবের অন্তর্নিহিত কল্পনাশক্তিকে ও অন্তশ্ছন্দবোধকে (sense of rhythm) ক্রিয়াশীল ক'রে তোলা। ভারতীয় নাট্যকলা তাই স্বাভাবিকতার দিকে অতিমাত্রায় জোর না দিয়ে, তাকে যথাযোগ্যভাবে বজায় রেখে, বিবিধ ও বিচিত্র উপায়ে নানা ছন্দলীলা সৃষ্টির দ্বারা দর্শকের চিত্তকে সরস ক'রে তোলবার প্রয়াসী। তাই কোনো পাত্র বা পাত্রী অভিনয়-সহকৃত কবিতার বা গানের সাহায্যে তার হৃদ্‌গতভাবকে ছন্দোময় রূপে (rhythmically) প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নৃত্যের সাহায্যে—সে নৃত্য পাত্রপাত্রীরই হোক বা অপর কোনো নর্তক বা নর্তকীর হোক— গানের বা কবিতার অন্তর্গত ভাবকে সামাজিকবর্গের হৃদয়ে অন্যবিধ ছন্দবিলাসের দ্বারা গভীরতর ভাবে মুদ্রিত করবার ব্যবস্থা ছিল। এদেশের প্রচলিত যাত্রাগানেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, অন্তত প্রাচীন যাত্রায় ছিল। পাত্রবিশেষ, যেমন রাজা, হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গের জগৎকে সালংকারে মায়াময় ব'লে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা ক'রে আবেগের সঙ্গে বক্তৃতা করলেন। তাঁরি কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে—

এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চ-মাঝে
রঙ্গের নটবর হরি যায় যা সাজান সে তাই সাজে।

ইত্যাদি গান কালোয়াতী সুরে জুড়ির দল (আজকাল ছেলের দল) গেয়ে উঠল এমন দেখেছি। আধুনিক শিক্ষাভিমানীরা এ ব্যবস্থাকে উপহাস্য মনে করলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞগণ, যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও কালের শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তাঁরা এর সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আধুনিক থিয়েটার ও সিনেমার (টকীর) উপদ্রবে এমন সুন্দর যাত্রাগান ক্রমশ লুপ্ত হবার পথে চলেছে।

মুখের কথায় সুললিত আবৃত্তিতে যে জিনিসটি মনে দোলা দিতে পারে তাকে গানের সাহায্যে যে আরো কার্যকরী ক'রে তোলা যায় সে কথা বলা

বোধ হয় বাহুল্য হবে। যদি তাই হয়, মুখের কথার সাহায্যে ছন্দোময় ভাবে প্রকাশিত বস্তুটিকে যথোপযুক্ত নৃত্য দ্বারা প্রতিরূপিত করলেই বা কেন সেটির প্রকাশ বেশি হৃদয়গ্রাহী না হবে? সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে যথাসম্ভব ঐক্যদান করাই ছিল ভারতের প্রাচীন নাট্যাচার্যদের কাজ। বস্তুত পরিষ্কারভাবে আবৃত্তি ক'রে কোনো ভাবকে প্রকাশ করবার পরে তাকে গীত বা নৃত্যের আনুষঙ্গিক অন্তচ্ছন্দের সাহায্যে রূপদান করলে তার সম্বন্ধে অনুভূতি অধিকতর জীবন্ত হয়ে ওঠে। এ কারণে দৃশ্যকাব্যের অভিনয়কালে তার কোনো কোনো দৃশ্যে নৃত্যসংযোগের বিধি ছিল। এই নৃত্য যোগ করার নিয়ম ছিল নায়ক নায়িকার অভ্যুদয়কালে, দম্পতির প্রণয়ব্যাপারমূলক দৃশ্যে, প্রিয়জন কাছে থাকার সময় যখন কোনো মনোরম ঋতু দেখা দেয় এবং এ-সকলের অনুরূপ অবস্থায় নাট্যান্তর্গত গানের পরে। স্থলবিশেষে নাচের নিষেধও ছিল। কোনো দৃশ্যে খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা বা কলহান্তরিতা নায়িকার উপস্থিতি থাকলে তাতে নৃত্যযোগ নিষিদ্ধ। নায়ক কাছে না থাকলে বা প্রবাসে গমন করলে বা নায়িকা সখীজনের সঙ্গে আলাপে রত থাকলেও নৃত্য চলত না।

গীত ও বাদ্য

নাট্যাভিনয়ের মাঝে মাঝে গান ও বাজনার সমাবেশ একেলে লোকদের অনেকের কাছে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঠেকে। বলা বাহুল্য যে, পাশ্চাত্য অভিনয়ের যে আদর্শ অনুসরণ ক'রে এদেশের আধুনিক নাট্যকলা গ'ড়ে উঠেছে তার জ্ঞান থেকেই তাঁদের এ ধারণা এসেছে। উক্ত আদর্শের তাগিদেই তাঁরা প্রচলিত নাটকগুলিকে কৃপার চোখে দেখে থাকেন। কিন্তু এ কথা জেনে রাখা ভালো যে, বাংলার আধুনিক নাট্যকলার যথার্থ ত্রুটি থাকলেও আপাত-প্রতীয়মান গান-বাহুল্য তার কারণ ব'লে গণ্য হওয়া উচিত নয়।

অতি আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পীরা এবং নাট্যপরিচালকগণ নাট্য অভিনয়ের সঙ্গে গান বাজনার কোনো মৌলিক বিরোধ মানতে নারাজ। এ বিষয়ের অন্যতম বিশেষজ্ঞ Th. Komisarjevsky বলেন, "নাট্যকলাকে যে সাধারণত নাটক, নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য নামক তিন ভাগে ভাগ করা হয় এর মূলে আছে কৃত্রিমতা। এদের সব কটিরই প্রধান উপাদান হচ্ছে নাটকীয় ঘটনার অভিনয়, যেটাকে প্রকাশ করতে হবে নানা রঙ্গমঞ্চের উপযোগী কলার সমাবেশের দ্বারা, এবং এদের প্রত্যেকটিকে নাট্যগ্রন্থ হিসাবেই প্রয়োগ করতে হবে। বাজনা ও নৃত্যাভিনয় বা ছন্দোময় অঙ্গচালনা গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মতো সাধারণ নাটকেও অপরিহার্য। নাট্যকলার এ তিন রূপের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ এই যে, প্রথমটিতে জোর দেওয়া হয় কথিত সংলাপের উপর, আর দ্বিতীয়টিতে জোর দেওয়া হয় গাওয়া-সংলাপের উপর আর তৃতীয়টিতে আঙ্গিক অভিনয়ের উপর। মুখের কথার উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে পাওয়া গেছে 'সাহিত্যিক' নাট্য। আর গীতিনাট্যে বিশুদ্ধ গানের উপর জোর দেওয়ায় বা গানের কস্‌রতের ফলে এসেছে সাজপোশাক-পরা লোকদের 'কনসার্ট'। নাচের কস্‌রতের উপর জোর দেওয়ার ফলে পাওয়া গেছে 'ক্লাসিক' ব্যালে।... এ তিন রকম নাট্যরূপ আলাদা আলাদা ভাবে খুব সংকীর্ণ নাট্যের সৃষ্টি করেছে; কিন্তু যথার্থ ও সম্পূর্ণ নাট্য-কলা পেতে হলে উক্ত তিনরকম নাট্যকে সুসমঞ্জস ভাবে ও আদর্শ পদ্ধতিতে একই প্রয়োগের মধ্যে সম্মিলিত করতে হবে।" ১২

---

১২ The division of theatrical art into the forms of legitimate drama, ballet and opera is an artificial one. The main element of all of them is dramatic action expressed in the synthesis of arts on the stage, and each of them should be produced as dramatic works. Music and ballet (or rhythmic movement) are essential

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাচার্যগণের মতও প্রায় ঠিক এই জাতীয় ছিল।

অভিনয়ের সঙ্গে বাজনার সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা বোঝাতে গিয়েও Komisarjevsky বলছেন, "আমার মস্কো থিয়েটারে ... ছাত্র ও অভিনেতাগণকে বাজনা এবং অভিনয়ের অন্তচ্ছন্দের মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞানদানের উদ্দেশে বাজনা এবং ছোটো 'অপেরা' ও মূকাভিনয় আদি গীতিনাট্যের প্রয়োগ-ব্যাপার শেখাতাম। আমি তাদের দেখিয়ে দিতাম যে, যদি তারা কোনো বাজনার সৌন্দর্য ভালো ভাবে উপলব্ধি ক'রে থাকে তবে তার অন্তর্নিহিত ভাবকে তারা বাজনার তালে তালে ছন্দোময় অঙ্গবিক্ষেপ দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে। তাদের আরো বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, কোনো বাজনা হৃদয়ে যে ভাব জাগিয়ে তোলে সেই বাজনার ছন্দে নব-উদ্ভাবিত কথার আবৃত্তি দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করা যেতে পারে।" [১৩]

---

in the real drama as well as in opera or ballet. The only difference between these three forms of theatrical art is that in the first the emphasis is laid on the spoken dialogue, in the second on dialogue which is sung and in the third on movement. The over-emphasis of the value of words in the drama produced the theatre of literature ; the over-emphasis of the value of pure music or acrobatic singing in opera resulted in concerts in costume, and over-stressing acrobating movements in ballet produced the so-called "classic" ballet...All these forms of theatrical art taken separately belong to a very limited theatre, whereas a real, complete theatre unites them one and all rhythmically and idealistically in one and the same production.

[১৩] To train the students and actors of my Moscow theatre... to understand the value of music and of rhythm in acting, I used to teach them music and to produce musical plays with them —light opera, mime, operettes. I showed them that if a piece of

এই যে বাজনার ছন্দের সঙ্গে অভিনয়ের ছন্দের নাড়ীর যোগ এটা প্রাচীন ভারতের নাট্যাচার্যগণও জানতেন ; তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

"বাদ্যেষু যত্নঃ প্রথমং তু কার্যঃ
শয্যা হি নাট্যস্য প্রথমং তু বাদ্যম্।
বাদ্যেঽপি গীতেঽপি চ সংপ্রযুক্তে
নাট্যস্য যোগো ন বিপত্তিমেতি ॥

বাদ্যের জন্যে প্রযত্ন সর্বাগ্রে করবে ; কারণ, বাদ্যই নাটকের শয্যা বা সুখে অবস্থানের জায়গা, এ কথা (পণ্ডিতেরা) বলেন। বাদ্য ও গীত সংযুক্ত হ'লে নাট্যপ্রয়োগ বিপন্ন হয় না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলায় গানের প্রয়োগ হত অন্তত তিন রকমে। একরকম প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল নাট্যোচিত আবহপরিমণ্ডলের সৃষ্টি। এরকম গান হত পূর্বরঙ্গে প্রস্তাবনা আদির আগে। অভিনেতব্য নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষত এর যোগ ছিল না। এর কথা পরে আলোচনা করা যাবে। গানের দ্বিতীয় রকমের প্রয়োগ ছিল সেই সময়ে নাটকের অন্তচ্ছন্দকে সাহায্য করা যখন পাত্রপাত্রীর মুখে কোনো বক্তব্য দেওয়া সম্ভবপর নয়। যেমন, অঙ্কের আদিতে কোনো মুখ্য পাত্রপাত্রী যখন রঙ্গ-স্থলে প্রবেশ করছে বা অঙ্কান্তে সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তারা হঠাৎ প্রবেশ করবে না, বা বেরিয়ে যাবে না। তাদের বেশ নৃত্যোচিত ভাবে পা ফেলে প্রবেশ করতে বা বের হতে হবে। এ প্রবেশভঙ্গী বা নিষ্ক্রমণ-ভঙ্গী থেকে বোঝা যেত কে কোন শ্রেণীর লোক। এই প্রবেশ বা বহির্গমনের

---

music is rightly felt by them they can express its emotions in rhythmical movements produced to it. They were also made to understand that feelings prompted by a piece of music could be expressed by words invented and said to the rhythm of that piece of music...

সময় উপস্থিত রসের অনুকূল 'ধ্রুবা' গান যথোচিত স্বরলয় সহকারে গাওয়ার রীতি ছিল। নানা স্বরলয় প্রয়োগের সুবিধা হবে ব'লে উক্ত গানগুলিকে তদনুসারে নানা আকারের ছন্দে রচনা করা হত। যেমন উদ্ধত প্রাবেশিকী ধ্রুবা গীতির গান পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ, আদি ছন্দে রচনা করার নিয়ম ছিল।

"প্রাবেশিকীনাং জাতিস্তু উদ্ধতানাং নিবোধত।
পংক্তিশ্চ ত্রিষ্টুভ্ জগতী তথাতিজগতী পুনঃ ॥"

ধ্রুবা গীতি প্রয়োগের আরো অনেক স্থল ছিল ; বাহুল্যভয়ে সে সকলের আলোচনা করা হ'ল না। এই ধ্রুবা গান দ্বারা নাট্য-প্রয়োগ বিশেষ শোভান্বিত হত, এই ছিল প্রাচীন আচার্যগণের মত। তাই শাস্ত্রকার বলেন—

"যথারসকৃতাঃ যা স্যুঃ ধ্রুবাঃ প্রকরণাশ্রয়াঃ।
নক্ষত্রানীব গগনং নাট্যমুদ্যোতয়ন্তি তাঃ ॥"

এই ধ্রুবা গীতি ছাড়াও স্থানে স্থানে নাট্যের অঙ্গীভূত গান ছিল; যেমন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রস্তাবনায় ও পঞ্চমাঙ্কে, এবং রত্নাবলীর প্রথমাঙ্কে।

গানের সঙ্গে যে বাজনার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ তা অনেকেই জানেন ; নাচের সঙ্গে বাজনার সম্পর্কও তেমনই অপরিহার্য ; যেহেতু গান ও নাচ উভয়েই তাল ও লয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে যে স্থলে ধ্রুবাগীতির প্রয়োগ ছিল সে সে স্থলে যথোপযুক্ত বাজনার অনুষঙ্গও দরকার হত। নাট্যোচিত পরিবেশ বা আবহপরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্যেও বাজনার ব্যবহার হত। এর কথা পরে বলা যাবে।

নাট্যপ্রয়োগ ও সামাজিকবর্গ

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে একথাটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কান ও চোখের সাহায্যে কোনো আখ্যানবস্তুর রস-গ্রহণে দর্শকদের (সামাজিকদের) সাহায্য করাই প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল। পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তা ও আচরণ রঙ্গস্থলে নিতান্ত যথাযথভাবে অনুকৃত হলেই তার দ্বারা

এ রসের উদ্রেক সম্ভবপর নয়। নাট্যের মতো শিল্পকলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকদের কল্পনাকে সক্রিয় ক'রে তার সাহায্যে রসকে উদ্বোধিত করা। কিন্তু মানুষের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলতে হ'লে অন্তত সাময়িকভাবেও তার চিত্ত-বৃত্তিকে বাইরের জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে; তার দৈনন্দিন জীবনের ভাবনা চিন্তা, তার নিজ দেহ ও দৈহিক-প্রয়োজনাদি সম্পর্কিত চিন্তাকে স্থগিত রাখতে হবে; তবেই সম্ভবপর হতে পারে ভূলোকে দ্যুলোকে কল্পনার স্বৈরগতি বিহার।

নাট্যদর্শক সামাজিকবর্গ যোগসিদ্ধ অসাধারণ পুরুষ নন, ইচ্ছামাত্রই তাঁরা নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিকে বাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে রসাস্বাদনের অনুকূল অবস্থায় আনতে পারেন না। তাই ভারতের প্রাচীন নাট্যাচার্যগণ সামাজিকদের চিত্তবৃত্তিকে রস-উপলব্ধির অবস্থায় আনবার জন্যে অভিনয় আরম্ভের প্রাক্‌কালে পূর্বরঙ্গের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

নাট্যের উদ্দেশ্য সামাজিকবর্গের (audience, spectators) চিত্তবৃত্তির রঞ্জন। 'রঞ্জন' কথাটির মানে 'রঙ দেওয়া'; কিন্তু কোনো কিছুতে রঙ মাখাতে হ'লে তাকে পরিষ্কার ভাবে রঙ মাখানোর উপযোগী ক'রে নিতে হয়, নইলে সে রঙ লাগে না। যেমন, মরচেধরা লোহা বা কাদামাখা কাঠের উপর রঙ মাখালে তাতে কোনো কাজ হয় না, সে রঙ নষ্ট হয় মাত্র। নাট্যের অভিনয়কালে সামাজিকবর্গের চিত্তবৃত্তি রঞ্জনের প্রচেষ্টার আগেও যদি তাদের চিত্তকে তদুপযোগী না ক'রে দেওয়া যায় তবে সমস্ত অভিনয়ের উদ্দেশ্য অংশত বিফল হতে পারে। তাই 'পূর্বরঙ্গ' বা সামাজিকবর্গের রঞ্জনের পূর্বকৃত্যের ব্যবস্থা। নাট্য আরম্ভের পূর্বে রঙ্গপীঠ বা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখভাগ একখানি যবনিকায় ঢাকা থাকত।[১৪] পূর্বরঙ্গের একাংশ অনুষ্ঠিত হ'ত এই যবনিকার অন্তরালে। বাদ্যযন্ত্রগুলিকে এবং বাদক ও গায়কমণ্ডলীকে

১৪ এ জিনিসটি অনেকটা আধুনিক drop-sceneএর অনুরূপ ছিল।

রঙ্গপীঠে সমবেত করা, নানা বাদ্যযন্ত্রের ঠাট বেঁধে তাদের বোল আবৃত্তি করে বাজনা ও গানবিশেষ শুরু করা ছিল এ অংশের কর্তব্য। (খুব সম্ভব, এ সময় সামাজিকবর্গ একে একে রঙ্গমণ্ডপে নাট্য-দর্শনার্থে সমবেত হয়ে আসন-পরিগ্রহ করতেন।)

গায়ক ও বাদকবর্গ তৈরি হ'লে সামনের যবনিকাখানি সরিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত তাল লয় সহকারে সময়োপযোগী ধ্রুবা-গান গাওয়া হত। এই গানের মধ্যে সূত্রধার শুদ্ধ (সাদা) বস্ত্রাবৃত হয়ে দুজন পারিপার্শ্বিক সঙ্গে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতেন। এঁদের একজনের হাতে থাকত জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, আর একজনের হাতে 'জর্জর' নামক যষ্টি। সূত্রধার সহকারীদ্বয়কে নিয়ে নৃত্যের চালে পদবিক্ষেপ ক'রে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। তার পরে সকলে মিলে সেই ব্রহ্মদেবকে অভিনয়সূচক ললিত হস্তচালনা দ্বারা বন্দনা করা হ'ত। এর পর ক্রমশ সূত্রধার ভৃঙ্গারবাহী পারিপার্শ্বিককে আহ্বান ক'রে আচমনাদি শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। এই সময় জর্জর নামক দণ্ডটিকে হাতে নিয়ে বাদ্যসহকৃত যথোচিত গতিতে নানা দিকপালগণকে বন্দনা করা হত এবং তারপরে কর্তব্য ছিল জর্জর-পূজা। এ সমস্ত ব্যাপারেই যথাকালে ধ্রুবাগান গাওয়া হ'ত এবং সূত্রধারাদি নৃত্যের ভঙ্গীতে পদক্ষেপ করতেন।

এ সকল অনুষ্ঠান শেষ হ'লে সূত্রধার নান্দী পাঠ করতেন। এই নান্দীর মধ্যে দেবদ্বিজ ও নৃপাদির স্তুতি থাকত, আর থাকত নাট্যের প্রবর্তয়িতা, দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা, নটকুল ও সামাজিকাদির প্রতি আশীর্বাণী। এই আশীর্বাদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকেরা পুনঃপুন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন, 'এবমস্তু', 'এবমস্তু', (এরূপ হোক্, এরূপ হোক্)। তার পরে 'জর্জর' নামক দণ্ডটি হাতে ক'রে নানা ভঙ্গীর নৃত্য প্রয়োগ করতেন সূত্রধার। সেটি শেষ হ'লে পারিপার্শ্বিকের হাতে জর্জরটি তুলে দিয়ে তিনি আবার 'মহাচারী' নামক নৃত্তের প্রয়োগ করতেন। তার পর নানাভাবে নৃত্তোচিত গতিতে রঙ্গপীঠের

উপর পদক্ষেপ করে সূত্রধার ধীরে ধীরে থামতেন। তৎপরে তিনি পারিপার্শ্বিক দুজনকে ডেকে নাটকের প্রস্তাবনায় অবতীর্ণ হতেন। এ প্রস্তাবনার নাট্য-শাস্ত্রোক্ত নাম 'ত্রিগত', যেহেতু এ বস্তুটি হচ্ছে তিন জনের অর্থাৎ সূত্রধার ও পরিপার্শ্বিকদ্বয়ের মিলিত কথোপকথন। প্রস্তাবনার লক্ষণ এবং উদ্দেশ্য আগেই বলা হয়েছে। এখান থেকেই সত্যিকারের নাট্যের সূচনা দেখা দিত বলা যায়।

সে যাই হোক্ তৎপূর্বেই 'পূর্বরঙ্গ' শেষ হ'ল বলে ধরা হ'ত। এ 'পূর্বরঙ্গ' অনুষ্ঠানের পরে ক্রমশ যথোচিত গান বাজনা সহকারে চল্‌ত নাট্যের অভিনয়। সামাজিকবর্গ তখন নিবিষ্টচিত্তে অনেকটা আত্মবিস্মৃতের মতো অভিনয় দেখতেন। দর্শনকালে তাঁদের আনন্দের ও তৃপ্তির আতিশয্য যে নানা আকারে প্রকাশ পেত তাদের বলা হত নটমণ্ডলীর 'সিদ্ধির লক্ষণ'। নাট্য-শাস্ত্রকার এই সিদ্ধিকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন: দৈবী ও মানুষী।

নাট্যমণ্ডপ জনসমূহে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ সামাজিকবর্গ যখন নিঃশব্দ ও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করেন তখন তাকে বলা হয় 'দৈবী' সিদ্ধি। আর 'মানুষী' সিদ্ধি দর্শকদের নানা শারীরিক চেষ্টা ও কথাবার্তার দ্বারা প্রকাশ পায়। যখন কোনো হাসির ব্যাপার অভিনীত হয় তখন যদি দর্শকেরা হাস্যের মাত্রানুসারে ঈষৎ-হাস্য, হাস্য ও অট্টহাস্য করেন, বা করুণরসের অভিনয় দেখে 'কী করুণ', 'কী দুঃখের' আদি বলেন, আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে 'চমৎকার', 'সাধু' আদি বলে উচ্চ শব্দ ক'রে ওঠেন, তবে তাকে নাম দেওয়া হয় 'বাঙ্ময়ী' (মানুষী) সিদ্ধি। আর যদি কোনো অভিনয় দেখে দর্শকদের পুলকজনিত রোমাঞ্চ হয় বা তাঁরা উৎসাহ দেখাবার জন্যে নটনটীকে উত্তরীয়াদি দান করেন তবে তাকে বলা হবে 'শারীরী' (মানুষী) সিদ্ধি।

সেকালকার নাট্যাভিনয় কোনো বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষে সামাজিকদের আনন্দ বিধানের জন্যে অনুষ্ঠিত হ'লেও প্রায়শ এর মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নাট্যাচার্য ও নটমণ্ডলীর যোগ্যতার পরীক্ষা চল্‌ত। এখনকার দিনে যেমন

নানা ক্রীড়ার (যথা টেনিস্, ক্রিকেট, দাবা আদির) প্রতিযোগিতা হয় আগেকার দিনে তেমনি নৃত্যের ও নাট্যপ্রয়োগের প্রতিযোগিতা হ'ত। গোড়ার দিকে দুইজন নাট্যাচার্যের প্রতিযোগিতাকে অবলম্বন করেই কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের গল্পাংশ বিকাশ-লাভ করেছে। বলা বাহুল্য যে এ ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হ'ত রাজারাজড়া বা ধনীলোক-দের উদ্যোগে। প্রতিযোগিতায় যে নাট্যাচার্য শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রতিপন্ন হতেন তাঁর পুরস্কার ছিল অর্থ ও পতাকা।

এই অর্থ ও পতাকা লাভের জন্যে নটগণের পরস্পরের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। তাই নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন—

"………অন্যোন্যস্পর্ধয়া চ ভরতানাম্।
অর্থপতাকাহেতোঃ সংঘর্ষো নাম ভবিষ্যতি।"

নটমণ্ডলীর অধিনায়কদের মধ্যে এ জাতীয় সংঘর্ষ হতে পারে এই মনে করে নাট্যদর্শনকালে বিশেষজ্ঞ মধ্যস্থ নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। তাঁদের বলা হত 'প্রাশ্নিক'।

নাট্যাভিনয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক বিচার করবার জন্যে বহু প্রাশ্নিক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। যেমন নাট্যান্তর্গত যজ্ঞাদির অভিনয়ে প্রাশ্নিক হতেন যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ, নৃত্তব্যাপারে নর্ত্তক, ছন্দ ও আবৃত্তির বিচারে নিযুক্ত হতেন এ বিষয়ে পণ্ডিত, রাজোচিত ভাবে রাজচরিত্র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় অভিনীত হচ্ছে কি না তার জন্যে কোনো রাজাকে প্রাশ্নিক পদ দেওয়া হত ইত্যাদি। নাট্যের অভিনয়কালে এসব বিশেষজ্ঞ যখন কোনো ত্রুটি পেতেন তখন সন্নিহিত লেখক তা লিপিবদ্ধ করতেন, আর এর আগে নাট্যের কৃতকার্যতা সিদ্ধি-সূচক যেসব লক্ষণের উল্লেখ করা গিয়েছে সে সকলও সঙ্গে সঙ্গে লিখে যাওয়া হ'ত। এ তালিকা থেকেই দুটি বা ততোধিক নটমণ্ডলীর মধ্যে গুণের তারতম্য বিচারের ব্যবস্থা ছিল।

নাট্যপ্রয়োগ সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য

যদিও নাট্যশাস্ত্রোক্ত নাট্যমণ্ডপের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা গিয়েছে, এবং নাট্যমণ্ডপ শুধু রাজারাজড়া বা ধনীদের গৃহেরই অঙ্গীভূত ছিল বলা হয়েছে, তবু প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয় যে কেবল সৌভাগ্যবান্ উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তা নয়। শিব বিষ্ণু আদি দেবতার যাত্রা [১৫] বা উৎসবোচিত শোভাযাত্রার উপলক্ষে প্রায়শ নাট্যাভিনয় হত, খুব সম্ভব সাময়িক ভাবে নির্মিত রঙ্গপীঠে। আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত নাট্যাভিনয়মূলক যাত্রা এরূপ নাট্যেরই ক্রমবিকশিত রূপ বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য থিয়েটার এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি দেশীয় যাত্রার মূল রূপ অনেকাংশে তিরোধান করেছে সেই থিয়েটারের প্রভাবে। তবু প্রাচীন যাত্রার অন্তর্গত গীতবাদ্যের (অন্তত গীতের) প্রাধান্য আধুনিক যাত্রায় বজায় আছে এবং সেই প্রাধান্য পাশ্চাত্য ধরনে রচিত নাটকগুলিকেও কথঞ্চিৎ প্রভাবিত করতে ছাড়ে নি।

নাট্যাভিনয় সেকালে খুব জনপ্রিয় ব্যাপার হলেও এতে সুরুচি এবং চরিত্রনীতির উচ্চ আদর্শ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আগেই বলা গিয়েছে যে নাট্যাভিনয়কে প্রাচীনেরা লোকশিক্ষার অঙ্গ ব'লেও ভাবতেন, কেবল রসাস্বাদন ক'রে অবসর বিনোদনের উপায় ব'লে মনে করতেন না। নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে কুৎসিত্ বা অশ্লীল কোনো ব্যাপারের প্রসঙ্গ না ঘটে সে সম্বন্ধে তাঁদের খুব সতর্কতা ছিল। সেজন্যে শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা এই যে—

> "ন কার্যং শয়নং রঙ্গে নাট্যধর্মং বিজানতা ॥
> "যদা স্বপেদর্থবশাদেকাকী সহিতোঽপি বা।
> চুম্বনালিঙ্গনং চৈব তথা গুহ্যং চ যদ্ভবেৎ ॥
> ....রঙ্গমধ্যে ন কারয়েৎ।"

---

১৫ যেমন রথযাত্রা, দোলযাত্রা ঝুলনযাত্রা, রামযাত্রা ইত্যাদি।

অর্থাৎ রঙ্গস্থলে শয়ন বা শয়িতাবস্থায় আলিঙ্গনাদি নিষিদ্ধ ছিল।

জনগণকে উত্তম আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার নানাদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলে প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা সেকালের জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এজন্যেই নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন—

'বেদ-অধ্যয়ন করলে যে সদ্‌গতি হয়, যজ্ঞ করলে যে সদ্‌গতি হয় আর দানশীলদের যে সদ্‌গতি হয় (পরকালে), ব্রহ্মপ্রোক্ত নাট্যশাস্ত্র যিনি শোনেন, প্রয়োগ করেন বা সে প্রয়োগ মনোযোগ সহকারে দেখেন তাঁরও সেই সদ্‌গতি হবে।"

"য ইদং শৃণুয়াৎ প্রোক্তং নাট্যমেতৎ স্বয়ংভুবা।
প্রয়োগং যচ্চ কুর্বীত প্রেক্ষতে চাবধানবান্॥
যা গতির্বেদবিদুষাং যা গতির্যজ্ঞযাজিনঃ।
যা গতির্দানশীলানাং তাং গতিং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥"

তারপরে নাট্যানুষ্ঠান দেবতাদেরও বিশেষ সন্তুষ্টিজনক ব'লে সেকালের লোকের বিশ্বাস ছিল। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

"গন্ধ-মাল্যের দ্বারা পূজিত হয়েও দেবতারা তত সন্তুষ্ট হন না যত সন্তুষ্ট হন নাট্য-প্রয়োগবিদ্‌গণের কৃত স্তুতিমঙ্গলের দ্বারা। আর গীতকলা ও নাট্য যিনি ভালো করে দেখেন ও উপভোগ করেন তিনি ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে সমান পুণ্যময় সদ্‌গতি লাভ করেন।"

"ন তথা গন্ধমাল্যেন দেবাস্তুষ্যন্তি পূজিতাঃ।
যথা নাট্যপ্রয়োগজ্ঞৈস্তুষ্যন্তি স্তুতিমঙ্গলৈঃ॥
গান্ধর্বঞ্চৈব নাট্যঞ্চ যঃ সম্যগনুপশ্যতি।
লভতে সদ্‌গতিং পুণ্যাং সম ব্রহ্মর্ষিভির্নরঃ॥

জনগণের এরকম শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ছিল বলে প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার এক অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। এই সুবিকশিত নাট্যকলার রূপ আজকাল আর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করবার কোনো উপায় নেই। মহাকালের অলঙ্ঘ্য

নিয়মে এর অনেকখানি আমাদের জ্ঞানের বাইরে চ'লে গেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ নাট্যকলা যে এক সময় সমগ্র পূর্ব এসিয়াকে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ দুর্লভ নয়।

ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যে সকল কথা বলা হ'ল তার থেকে প্রাচীন নাট্য-কলার একটা মোটামুটি স্বরূপ আন্দাজ করা যেতে পারে এমন ভরসা করা যায়। এখন কৌতূহল হতে পারে যে, এ নাট্যকলার উৎপত্তি হ'ল কবে এবং কেমন করেই বা এ জিনিস কালক্রমে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের লোকদের মনোহরণ করতে পেরেছিল।

ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তির সম্বন্ধে সুপ্রাচীন তথ্যমূলক কোনো বর্ণনা দেওয়া শক্ত; তবে নানা আনুষঙ্গিক ব্যাপার থেকে এর সম্বন্ধে কিছু কিছু যুক্তি-সংগত আন্দাজ করা যেতে পারে। ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে যে জিনিসের আমরা গৌরব করি তা মুখ্যত দ্রবিড় ও আর্যভাষাভাষী দুই মহাজাতির সম্মিলিত সাধনার ফল। কিন্তু ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তির ব্যাপারে এই আর্যদের দান বোধ হয় এমন বেশি নয় যাকে গণনার মধ্যে আনা যায়। ঐতিহাসিক কালের ভারতীয় নাট্যকলায় যে নাচের লক্ষণীয় (characteristic) প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় সে নাচ প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের মধ্যে কী পরিমাণে প্রচলিত ছিল তা জানা যায় না। খুব সম্ভব তাঁদের মধ্যে নাচ খুব সুপ্রচলিত বা সুবিকশিত ছিল না। ঋগ্‌বেদাদি গ্রন্থে নাচের ও নর্তকীর কথা পুনঃপুন পাওয়া গেলেও এরূপ অনুমান অসংগত না হতে পারে। কারণ, বৈদিক সভ্যতার ছবি আমরা বেদের যে মন্ত্রাংশে পাই তার উৎপত্তি হয়তো হয়েছিল এমন এক অর্বাচীন কালে (খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০—৭০০) যখন আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতা বহুল পরিমাণে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। অথর্ববেদের

একটি মন্ত্রাংশ হয়তো এ প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্তাবশিষ্ট সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ মন্ত্রটিতে ঋষি (যিনি নিশ্চয় ছিলেন নবাগত আর্যদের প্রতিনিধি স্থানীয়) বলছেন যে "একে গান ও নাচ কে দিল ?" অস্মিন্‌…বাণং কো নৃত্তো দধৌ। এ মন্ত্রটি দেখে অনুমিত হয় যে, ভ্রাম্যমান ইন্দো-য়ুরোপীয় দলের অংশভূত ভারতীয় আর্যগণ নিজেদের মধ্যে কখনো উচ্চাঙ্গের গান বা নাচ দেখেন নি। তাই ভারতবর্ষে এসে এসব দেখে তাঁদের বিস্ময় লেগেছিল। সেজন্যেই হয়তো মন্ত্রের ভিতর দিয়ে অথর্ববেদের ঋষি ঐতিহাসিক সত্যটিকে নিজের অজ্ঞাতসারে স্থায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

আর্যদের মধ্যে নাচগানের উন্নতি কী পরিমাণে হয়েছিল তা জানবার কোনো ফলদায়ক উপায় না থাকলেও দ্রবিড়দের নাচগানপ্রিয়তা সম্বন্ধে তা হয়তো বলা যায় না। আর্যপূর্ব ভারতে উপনিবিষ্ট দ্রবিড়গণ যে আর্যদের চেয়ে কোনো কোনো অংশে সভ্যতর ছিলেন তাতে কোনো সংশয় নেই। সভ্যতা হিসাবে তাঁদের উৎকর্ষের এক প্রমাণ হচ্ছে তাঁদের শিল্প বা কলা [১৬]। 'শিল্প' ও 'কলা' এ দুটি কথাই মূলত দ্রবিড় ভাষার কথা। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় এ শব্দ দুটি গৃহীত হওয়া থেকে শিল্প বা কলার নানা ক্ষেত্রে দ্রবিড়দের উৎকর্ষ সহজেই প্রমাণিত হয়। দ্রবিড়দের বংশধরগণ বহুল পরিমাণে আর্য সংস্কৃতি-প্রভাবিত হয়েও তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত নাচ বা নাট্যকলা এখনো বজায় রেখেছেন বহুল পরিমাণে। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানের নটনর্তকমণ্ডলীই এর প্রমাণ।

বেদপন্থী ব্রাহ্মণগণ গোড়ার দিকে নাচগানকে খুব সহজে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, দ্রবিড়গণের মধ্যে সুপ্রচলিত শিশ্নদেবের পূজাকে তাঁরা যে ভাল চোখে দেখেন নি বেদে তার প্রমাণ আছে। অথচ

---

১৬ এ দুটি কথা প্রায় সমার্থক হলেও ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি, রাজা-বাদশা আদি শব্দযুগ্মের মতো 'শিল্পকলা' এই সংযুক্ত রূপেও ব্যবহৃত হয়।

নাচগানের উৎপত্তির আদিম ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জীব-জন্তু ও শস্যাদির উৎপাদিকাশক্তির বর্ধনমূলক অনুষ্ঠানগুলির (fertility rites) সঙ্গে ছিল এর ঘনিষ্ঠ যোগ। দ্রবিড়েরা যে প্রকৃতি-পুরুষের পূজা করতেন তার লিঙ্গপূজাত্মক রূপটিকেই আর্যেরা 'শিশ্নদেবে'র উপাসনা নাম দিয়ে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এ লিঙ্গপূজার সঙ্গেও মৌলিক যোগ আছে পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানের। এখনো পর্যন্ত শিব নটরাজ নামে নাট্যাধি-দেব বলে পূজিত হয়ে নাট্যের সঙ্গে শিশ্নদেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই যে কোনো কারণেই হোক শিশ্নদেবের পূজায় অনভ্যস্ত আর্যগণ গোড়াতে নাচগানকেও খুব ভালো চোখে দেখেন নি ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বেদের মন্ত্রাংশে পাওয়া নাচ ও নর্তকী সম্বন্ধীয় নানা কথা থেকে মনে হয় যে, তাঁদের এই 'পিয়ুরিটানিক' মনোবৃত্তি দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকে নি। তাঁরাও ধীরে ধীরে নাচগানের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু নাচ-গানই নাট্য নয়; কোনো সংলাপাত্মক গল্পাংশকে নাচগানের যোগে অভিনয় করলেই তবে তা হয়ে ওঠে নাট্য। এরকম সংলাপাত্মক গল্পও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গিয়েছে। 'পুরুরবা উর্বশী' ও 'যম যমীর সংবাদ' এ জাতীয় সংলাপের সুস্পষ্ট উদাহরণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কেউ কেউ এদের এক রকমের 'নাটক' বলেই মনে করেন। উল্লিখিত সূক্ত দুটির মধ্যে যমযমীর সূক্তটিকে কেউ কেউ উৎপাদিকাশক্তিবর্ধক অনুষ্ঠানের অঙ্গ বলে ধরে নিতে চান, কারণ তার মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠানের উপ-যোগী প্রচুর আদিরসের উপাদান বিদ্যমান। বৈদিক যুগে কেবল যে নাচ গান ও নাট্যোপযোগী সংলাপ ছিল তা নয়, নানা বাদ্যের ব্যবহারও ছিল যথেষ্ট। কাজেই অন্তত বৈদিক যুগের শেষের দিকেই (আঃ খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ শতক) ভারতের নাট্যকলা তার মোটামুটি রূপটি (যে রূপ আমরা ঐতিহাসিক কালে দেখতে পাই) পেয়েছিল তা প্রায় নিঃসংকোচে অনুমান করা যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের সময়ে যে নাট্যকলার চর্চা ছিল তারও অনুমানে গুরুতর বাধা আছে বলে মনে হয় না।যে 'সিক্‌খা' (শিক্ষা) পদগুলির মধ্যে "নচ্চ-গীত-বাদিত্ত' (নৃত্য-গীত-বাদ্য), ও 'পেক্‌খা' (প্রেক্ষা) দর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে সে গুলি বুদ্ধের সমসাময়িক। কারণ, এ সিক্‌খা-পদগুলি বুদ্ধ-শিষ্যদের আচরণীয় মৌলিক নিয়মসমূহের অন্তর্গত। নাট্যশাস্ত্রে (খ্রীস্টীয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দী) 'প্রেক্ষা' শব্দ নাট্যাভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই প্রায় হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময়েও যে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত না হতে পারে।

বুদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে নাট্যাভিনয় দর্শন নিষিদ্ধ ক'রে গেলেও তাঁদের কেউ কেউ সে উপদেশ পরবর্তীকালে বেশ পুণ্যজনকভাবে অতিক্রম করেছিলেন। খ্রীস্টের পরবর্তী দ্বিতীয় শতকের দিকে রচিত গ্রন্থাদিতে দেখতে পাই বুদ্ধের শিক্ষাকে লোকমধ্যে প্রচার করবার জন্যে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের কাহিনী নিয়ে নাটক রচিত হচ্ছে।

'অবদানশতক' নামক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থের একটি কাহিনীতে লিখিত হয়েছে যে, ক্রকুচ্ছন্দ নামে কোনো অতীত যুগের বুদ্ধ শোভাবতী নগরীতে এক দল নটকে দিয়ে নাট্যাভিনয় করিয়েছিলেন। সূত্রধার নটাচার্য নিজে সেজেছিলেন বুদ্ধ, আর তাঁর দলের অন্য নটেরা বুদ্ধের সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী। জন্মান্তরে এই দলটিই রাজগৃহে গৌতম বুদ্ধের সামনে আবার নাট্যাভিনয় করে। সেই নটমণ্ডলীর মধ্যে কুবলয়া নামে এক যশস্বিনী নটীর নাম পাওয়া যায়। তার উত্তম অভিনয় ও হাবভাব দেখে অনেক সন্ন্যাসী বুদ্ধশিষ্যের পদস্খলন ঘটেছিল। তাই বুদ্ধদেব তাকে বিরূপা ক'রে দিয়ে নির্বাণের পথে টেনে নেন। বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী নিয়ে নাট্য-রচনার প্রথার সন্ধান কোনো প্রাচীন তিব্বতী গল্পেও পাওয়া যায়। সে যাই হোক, বুদ্ধের পার্শ্বচরদের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত নাটকের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন অশ্বঘোষ-রচিত 'শারীপুত্রপ্রকরণ'। সুপ্রসিদ্ধ জর্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিত

হাইনরিখ্ ল্যুডর্স্ এ নাটকখানির কতিপয় ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেছেন। এ ভগ্নাংশগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের ভারতীয় নাটক, কালিদাসের সময়ের (৫ম শতক) নাটকের মতোই পূর্ণবিকশিত ছিল।

ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ব্যাপারে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রীক নাট্যকলার প্রভাবের কল্পনা করেছেন। কিন্তু এ অত্যন্ত কষ্টকল্পনা। এ বিষয়ে প্রমাণের জন্য 'যবনিকা' শব্দের উপর তাঁদের কেউ কেউ জোর দিয়েছেন। সে শব্দটি মোটেই 'যবন' [Ionian] শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। মূল কথাটি হচ্ছে 'যমনিকা' যা সেকালের প্রাকৃতে হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'জবনিকা'। এ শেষোক্ত রূপে শব্দটি 'জ'কার পরিবর্তন করে আবার 'যবনিকা' রূপ ছদ্ম-সংস্কৃত (pseudo-Sanskrit) চেহারা নিয়েছে। আর প্রাচীন গ্রীক্ রঙ্গপীঠে কোনো যবনিকা বা পরদা'র ব্যবহারই ছিল না। এ ছাড়াও গ্রীক্ নাট্যকলার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের নাট্যকলার কতকগুলি মৌলিক ভেদ আছে। সেজন্য উভয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ কল্পনা করা খুব কষ্টসাধ্য।

গান্ধার প্রদেশের গ্রীক্-প্রভাবযুক্ত মূর্তিশিল্প দেখে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে ঐ শিল্পের প্রেরণা ভারতীয়েরা গ্রীক্‌দের কাছ থেকেই পেয়ে ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। কোনো কোনো পণ্ডিত এ মতের খণ্ডন ক'রে, স্বাধীনভাবে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের উৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। মূর্তিশিল্পের বেলায় যাই হোক না কেন, নাট্যকলার বেলায় গ্রীক্ প্রভাব আসা একটু অসম্ভব মনে হয়। যতদূর দৃষ্টি চলে তাতে ভারত-বর্ষের মধ্যদেশকেই নাট্যকলার উৎপত্তিস্থান ব'লে মনে হয়। এর এক প্রধান কারণ নাট্যে শৌরসেনী প্রাকৃতের (তথা সংস্কৃতের) উচ্চ স্থান। প্রধান প্রধান নায়ক-নায়িকারা হয় শৌরসেনীতে নয় সংস্কৃতে কথা কন, এমন কি ধ্রুবা গীতও হবে শৌরসেনী প্রাকৃতে। এই শৌরসেনী, শূরসেন বা মথুরা অঞ্চলের ভাষা

আর মথুরা হল গিয়ে মধ্যদেশের প্রায় কেন্দ্রস্থান। মনুসংহিতা অনুসারে মধ্যদেশ ছিল পরবর্তী ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির রাজধানী। এখানকার দ্বিজগণ সংস্কৃত খুব ভালই জানতেন। কাজেই যে নাট্যে সংস্কৃত এবং শৌরসেনীর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি সে নাট্য যে মধ্যদেশের লোকদের জন্যে গ'ড়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নাট্যোৎপত্তির স্থানটির সম্বন্ধে আন্দাজ করা গেলেও পরবর্তী ভারতীয় 'ক্লাসিক্যাল' নাট্যের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা এখনো সম্ভবপর নয়। তবে নানা পরোক্ষ প্রমাণের বলে এই অনুমান করা যেতে পারে যে, বৈদিকযুগের শেষে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কিছু পূর্বেই হয়তো ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নাট্য গড়ে উঠেছিল। এই নাট্যকলারই সর্বোচ্চ নিদর্শন ছিল ভাস ও কালিদাসের নাটকগুলির প্রয়োগ।

দেশ-বিদেশে ভারতীয় নাট্যকলা

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নি। ভারতে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম, জন্তুজানোয়ারের গল্প (যেমন পঞ্চতন্ত্রাদি), দশগুণোত্তর (decimal) সংখ্যা-লিখনের পদ্ধতি, চতুরঙ্গক্রীড়া (দাবা খেলা) আদির মতো এ জিনিস দেশবিদেশে, বিশেষ ক'রে পূর্ব এশিয়ায় ও দ্বীপময় ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্যামদেশ (অধুনা 'থাই' ভূমি, Thai-land), মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও বালি দ্বীপের নাটক যে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের বংশধর, এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সংশয়ের সঙ্গে হলেও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'যাভাযাত্রীর পত্রে' যবদ্বীপের নাট্য ও নৃত্যের যে বর্ণনা করেছেন তার থেকে ভারতীয় নাট্যের সঙ্গে তার জ্ঞাতিত্ব আন্দাজ করা যায়। ব্রহ্মদেশের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কোনো ভালো আলোচনা

হয় নি; খুব সম্ভব এ দেশের নাট্যকলাও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু বহির্ভারতের এসকল দেশের নাট্যকলা ভারতীয় নাট্য থেকে উদ্ভূত হলেও এদের আধুনিক রূপের মধ্যে সবটুকু যে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের প্রতিচ্ছায়া, তা বোধ হয় নয়। এ দেশগুলিতে তৎকালীন বা আদিম যে সকল নাচ বা নাট্যজাতীয় নৃত্যাদি চলিত ছিল সেগুলির কিছু কিছু প্রভাবও তাদের মধ্যে এসে গেছে নিশ্চয়।

চীনে জাপানেও যে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার প্রভাব এবং প্রেরণা বিশেষভাবে কাজ করেছে তা বিশেষজ্ঞগণের চোখ এড়ায় নি। তবে তাঁরা এ প্রভাবের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন নি।

পশ্চিম এসিয়ায় এবং সেখান থেকে পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা কোনো প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা জানা যায় না। অশ্বঘোষের নাটক ও তার সঙ্গে পাওয়া আর একখানি নাটকের ভগ্নাংশ থেকে মনে হয় বৌদ্ধপ্রচারকগণই ছিলেন 'মিরাকল্‌স্' ও 'মর্যালিটি প্লে'গুলির প্রবর্তক। এরূপ অনুমান যদি সত্যি হয় তবে খ্রীষ্টীয় গির্জা-সম্পর্কিত পূর্বোক্ত নাটকগুলির মূলেও বৌদ্ধদের তজ্জাতীয় নাটকগুলির প্রভাব থাকা একেবারে অসম্ভব না হতে পারে। খ্রীস্টধর্মের ও সংঘের (church) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-ব্যাপারে যে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের বিশেষ প্রভাব ছিল এটি একাধিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত। এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত না হলেও একে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ হবে। কারণ, যে সুমহান্ ধর্ম সমগ্র পূর্ব ও উত্তর এসিয়ার কোটি কোটি জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রভাব পশ্চিমে কোনো কাজই করে নি এরূপ বিশ্বাস কষ্টকল্পিত। ধর্ম কোনো কাজ না করলেও সর্বজনীন আনন্দবিধানের উপায়স্বরূপ নাট্যকলা যে পশ্চিম-অভিযানে দুর্জয় বাধা পেয়েছিল তা খুব সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পেলে জোর ক'রে কিছু বলা সমীচীন হবে না।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে এ পর্যন্ত এদেশের কোনো বিদ্বান্ বহির্ভারতে ভারতীয় নাট্যকলার প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান ও আলোচনায় যথোচিত উৎসাহ দেখান নি। এ কাজে ঐকান্তিকভাবে মনোযোগ দেওয়ার পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বৃহত্তর ভারতের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া দুঃসাধ্য।

প্রাচীন নাট্যকলা ও আধুনিক কাল

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে বাংলাদেশে প্রাচীন নাট্যকলা জীবিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলা অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত নাটকগুলি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এ সকল নাটক যে, অভিনয়ের জন্যে লিখিত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তার উপর 'চৈতন্যভাগবত' থেকে জানতে পারি যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবও একদা নাট্যাভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য সে নাট্য ভগবানের লীলাবিষয়ক। এতে মহাপ্রভু সেজেছিলেন লক্ষ্মী, গদাধর রুক্মিণী, নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ি, শ্রীবাস নারদ এবং হরিদাস কোতোয়াল। অভিনয়কালে শ্রীচৈতন্যদেব স্ত্রীজনসুলভ লাস্য নৃত্যও করেছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে (মধ্যম খণ্ড ১৮শ অধ্যায়) আছে—

লক্ষ্মীবেশে অঙ্গনৃত্য করিল ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥

স্ত্রীচরিত্রসমূহে নাট্যোচিত বেশ রচনার জন্য মহাপ্রভু আদেশ দিচ্ছেন—

শঙ্খ কাঁচুলী পাটশাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জা কর সবাকার ॥

যথাযোগ্য বেশে মহাপ্রভু আদির নৃত্য যে মুনিজনেরও মনোহারী হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তিনি নিজেও তা আন্দাজ করেছিলেন। তাই আগে থেকে তিনি ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন—

প্রকৃতিস্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার ॥

প্রাচীন নাট্যের এ ধারা হয়তো বাংলাদেশের প্রাচীন যাত্রার মধ্যে বর্তমান ছিল, কিন্তু আধুনিক থিয়েটারী ঢঙের যাত্রা থেকে সে রূপটি অনেক পরিমাণে বিদায় নিয়েছে।

প্রাচীন নাট্যের ধারাটি দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো স্থানে এখনো কিয়ৎ পরিমাণে আগের মতো চেহারা বজায় রেখেছে। 'কথকলি' নামক নৃত্যানুষ্ঠান ও 'চাক্কিয়ার' সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত নাট্যকলার আলোচনা ক'রে একথাই মনে হয়। এ ছাড়াও ভারতবর্ষের নানা স্থানের লোক-নাট্যে ও লোক-নৃত্যে হয়তো প্রাচীন ভারতীয় নাট্যের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও আলোচনা এখনো হয় নি। আশা করা যেতে পারে যে সুযোগ্য ও উৎসাহী বিদ্বানদের নজর এদিকে আকৃষ্ট হবে। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে এদিকে মনঃসংযোগ করা একান্তভাবে অপরিহার্য।

কয়েকটি শব্দের অথ

উদাত্ত নায়ক— উচ্চশ্রেণীর বা উচ্চবংশোদ্ভব নায়ক।

কলহান্তরিতা— প্রত্যাখ্যাত নায়ক চলে গেলে পশ্চাত্তাপযুক্তা।

খণ্ডিতা— অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্নযুক্ত নায়ককে দেখে রোষযুক্তা।

তাল— দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ, করতলের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ (শিল্পশাস্ত্রে ব্যবহৃত)।

বিট— রাজপুত্রাদির বা বেশ্যাজনের সুশিক্ষিত অনুগ্রহজীবী।

বিপ্রলব্ধা— নায়কের দ্বারা প্রতারিতা, সংকেত করেও নায়ক কেন এলেন না এই চিন্তায় নির্বেদযুক্তা।

ভ্রমসংশোধন

৯।২৩ ছত্রে সংগীদসালা। ২৩।২০ ছত্রে অ্যাক্‌শন্'। ২৬।৭ ছত্রে ১৬ স্থলে ৩২।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ